সূদ

- একটি ভয়ংকর অভিশাপ
- পরিত্রাণের উপায়
- প্রসঙ্গ : জিজিএন ও ডেসটিনি
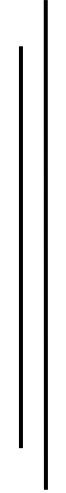
প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশক: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা. ফা. বা. প্রকাশনা-২৮

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ২০০৯ খৃষ্টাব্দ।
ছফর, ১৪৩০ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা।

কম্পিউটার কম্পোজ: হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স।
কাজলা, রাজশাহী।

মুদ্রণে: দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী। ফোন: ৭৭৪৬১২

নির্ধারিত মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

SUDER OVISHAP O PARITRANER UPAI
by: **Shah Muhammad Habibur Rahman.** Professor of Economics, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH. Kajla, Rajshahi. Ph & Fax: 0721-861365. Ph: 760525. Price: Tk. 20 only.

প্রকাশকের কথা

সূদ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পৃথিবীর আদিকাল থেকে সূদ ভিত্তিক ঋণদান ব্যবস্থা চলে আসছে। যার মন্দ প্রেরণা হচ্ছে ঋণ গ্রহিতাকে বাগে পেয়ে শোষণ করা। বিপদগ্রস্ত মানুষকে ঋণ দিয়ে উপকার করার মানবিক তাকীদ এর ফলে ধ্বংস হয়ে যায়।

সকল নবী ও রাসূল এবং মুসলিম-অমুসলিম সকল মণীষী যুগে যুগে সূদকে শোষণের হাতিয়ার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং সূদ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উপদেশ দিয়েছেন। মদীনায় ইসলামী খেলাফতের সময়েই মানুষ প্রথম সূদ বিহীন ইসলামী অর্থনীতির সুফল ভোগ করে এবং ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে আরবের কোথাও যাকাত নেওয়ার মত গরীব এবং হকদার খুঁজে পাওয়া যেত না। আজও সেটা সম্ভব যদি জনগণ সচেতন হয় এবং সেভাবে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো হয়।

বাংলাদেশের জনগণকে সূদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। এজন্য আমরা দেশের খ্যাতনামা ইসলামী অর্থনীতিবিদ এবং ইসলামী ব্যাংকের বিগত ২৫ বছর যাবত কেন্দ্রীয় শরী'আহ কাউন্সিলের মাননীয় সদস্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের মূল্যবান তিনটি নিবন্ধ, যা ইতিপূর্বে মাসিক আত-তাহরীকে (অক্টোবর ২০০১, মার্চ ও মে ২০০৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা লেখক কর্তৃক পুনরায় সংশোধিত হয়ে বই আকারে বের করতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি।

পবিত্র কুরআনের সাতটি আয়াত এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা সূদের নিষিদ্ধতা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূদের অর্থ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তার শেষ পরিণতি হ'ল দরিদ্রতা *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)।* অথচ বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে সূদী অর্থনীতি চালু রয়েছে। সূদের কিস্তি শোধ করতে না পারলে একদিকে সরকার পিটাচ্ছে ও জেল খাটাচ্ছে। অন্যদিকে গ্রাম্য সূদী মহাজন ও এনজিও-র লোকেরা ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাচ্ছে। কেউবা ঋণভারে জর্জরিত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ গাছে বেঁধে রেখে অন্যদের ভয় দেখাচ্ছে। এসব দুনিয়াবী যুলুমের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে ঈমানদারগণকে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। যদি এর দ্বারা সরকার ও জনগণ হুঁশিয়ার হন এবং সূদ থেকে বিরত হন এবং সর্বোপরি আল্লাহ আমাদের এ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা কবুল করেন, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব। মাননীয় লেখক লেখাটিকে ছাদক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন'কে দান করেছেন। আল্লাহ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

পরিচালক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

ভূমিকাঃ

সমাজ শোষণের যতগুলো উপায় এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে, ধনীকে আরও ধনী এবং গরীবকে আরও গরীব করার যত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে সূদ তাদের মধ্যে সেরা। কৌশল, পদ্ধতি, ফলাফল, অর্থনীতির চূড়ান্ত অনিষ্ট সাধন- সকল বিচারেই সূদের কাছাকাছি কোন সমাজবিধ্বংসী হাতিয়ার নেই। ইলাহী গ্রন্থ তাওরাতের যে অংশটি বাইবেলের ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’ নামে পরিচিত তা থেকেই জানা যায় সূদের প্রচলন হয়েছিল আরও অতীতে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর পূর্বেও সূদ বিদ্যমান ছিল। আজও সেই সূদ অপ্রতিহত গতিতে সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সূদকে সব সময়েই কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, সূদখোরদের সামাজিক শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সূদ বর্জনেরও আহ্বান জানানো হয়েছে যুগে যুগে। কোন এলাহী গ্রন্থেই সূদের লেনদেনকে সমর্থন করা হয়নি, বৈধতা দেওয়া হয়নি।

সূদের সংজ্ঞাঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূদকে সর্বৈব নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَـــرَّمَ الرِّبَـــا ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করা করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

কেন এই ঘোষণা? রিবা (الربوا) বা সূদকে কেন হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হ’ল? এজন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন রিবা বা সূদ কি? রিবা কাকে বলে? আরবী রিবা শব্দের আভিধানিক অর্থ হ’ল বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম বা নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমর চাপড়ার মতে শরী‘আতে রিবা বলতে ঐ অর্থকেই বোঝায় যা ঋণের শর্ত হিসাবে মেয়াদ শেষে ঋণগ্রহীতা অতি অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও ছিল। সে যুগেও তারা প্রথাসিদ্ধভাবে ঋণ দিত এবং শর্ত অনুসারে তার উপর মাসে মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হ’ত এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হ’ত তখন সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেওয়া হ’ত *(তাফসীরুল কাবীর)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হ'ল রিবা। ইমাম আবুবকর আল-জাসসাস 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহিলী যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণ গ্রহণের সময়ে ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হ'ত। তাতে স্বীকার করে নেওয়া হ'ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের উপর একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল মূলধন ঋণগ্রহীতাকে আদায় করতে হবে।

প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর বলেন, 'জাহেলী যুগে প্রচলিত ও কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হ'ল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা'। আরবরা তাই-ই করত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সূদ বাড়িয়ে দেওয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে দিত *(তাফসীর ইবনে জারীর)*।

এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝির নিরসন হওয়া প্রয়োজন। অনেকে কুরআন ও হাদীছে যে রিবার উল্লেখ রয়েছে তার অর্থ করেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য দেওয়া ঋণের বিনিময়ে আদায়কৃত অতিরিক্ত অর্থ বা Usury। এদের মতে, ব্যবসায়িক কাজে লগ্নিকৃত অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় বাড়তি অর্থ বা Interest এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের মতে Usury বা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ আদায় নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য হ'তে পারে। কারণ এতে শোষণ ও পীড়নের সুযোগ বা আলামত রয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত অর্থ বা আজকের দিনে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কর্তৃক আদায়কৃত সূদ বা Interest নির্দোষ। কেননা এখানে কারো উপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। বরং ব্যবসায়িক লেনদেনের মতোই উভয়ের সম্মতিক্রমেই সূদের হার স্থিরীকৃত হচ্ছে। এই সূদও সরল সূদ এবং হারও যথেষ্ট কম, সাধারণত ৮%-১৮%। উপরন্তু এই ঋণে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয়। ফলে ঋণগ্রহীতার আয়ও বৃদ্ধি পায়। তার পক্ষে তাই 'মূলধনের সময়ের প্রাপ্য' পরিশোধ করাই যুক্তিযুক্ত। তাদের দৃষ্টিতে এখানে কোন যবরদস্তি বা যুলুমের উপাদান বিদ্যমান নেই। বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থের যে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় সূদ গ্রহণের ফলেই তা পূরণ হয়। ফলে মূলধন অবিকৃত থাকে।

তিনটি কারণে এই ব্যাখ্যা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমতঃ সমগ্র আরব দেশে আরবী 'রিবা'(الربـــوا) শব্দের অর্থ সূদই করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর কোন বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা বা ভিন্ন কোন অর্থ প্রযুক্ত হয়নি। তাই সূদের ভিন্নতা বা প্রকারভেদ বোঝার জন্য ইংরেজী, বাংলা বা অন্য কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করে অযৌক্তিক ধুম্রজাল সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। উদারহরণতঃ ইসলামে সূদ যেমন হারাম, মদও তেমনি হারাম। তাই একটা গ্লাসের পুরোটাই রঙিন মদে ভর্তি ও আরেকটা গ্লাসের তলায় রাখা ও সাদা রঙের কিঞ্চিৎ মদের মধ্যে আসলেই প্রকৃতিগত বা বস্তুগত কোনও পার্থক্য নেই। পার্থক্য রঙের ও পরিমাণের। Interest ও Usury এর পার্থক্যও তাই মাত্রাগত, গুণগত নয়।

দ্বিতীয়তঃ জাহেলী যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য রীতিমত পুঁজি লগ্নী করা হ'ত এবং সেজন্য সূদ আদায় করা হ'ত। সে সময়ে অনেকেই আজকের মত ফার্ম খুলে এজেন্ট নিয়োগ করে সুদে পুঁজি খাটাত। এদের মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ও বনু মুগীরার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। তাদের আদায়কৃত সূদকে আরবীতে রিবাই বলা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচার সূদী কারবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং খাতকের কাছে প্রাপ্য বকেয়া সূদ রহিত করে দিয়েছিলেন।[১]

তৃতীয়তঃ যারা 'মূলধনের সময়ের প্রাপ্য' পরিশোধ করতে বলেন তাদের আচরণ গল্পের সেই একচোখা হরিণের মতই। মূলধনের সময়ের প্রাপ্য যদি ঋণদানকারীর ক্ষেত্রে স্বীকৃত হয় তাহ'লে ঋণ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? তার তো বরং সময়, মেধা ও শ্রম সবই একই সময়ে ঐ অর্থের পেছনে খাটছে। এছাড়া যারা বলেন, অর্থের ক্রয়ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সূদ নেওয়া প্রয়োজন, তারা ভুলে যান যে শুধুমাত্র সূদ আদায় করেই অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থির রাখা যায় না। এজন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যরূরী। তাই যারা Interest ও Usury-কে ভিন্ন বিষয় হিসাবে দেখতে চান তারা আসলে বিশেষ মতলব হাছিলের উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলেন।

এ বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদদের অধিকাংশের মধ্যেই কিন্তু মতদ্বৈততা নেই। বিশেষতঃ রাসূলপূর্ব জাহেলী যুগে এবং আরবী ভাষায় যে অর্থে রিবার ব্যবহার হ'ত তা Interest ও Usury উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। এ ব্যাপারে

---

১. *আবুদাঊদ হা/১৯০৫।*

সকলেই ঐক্যমতে পৌঁছেছেন।[২]

বস্তুতঃ ইসলামে যে সূদ হারাম বলে গণ্য সে সূদ যত রকম নামেই পরিচিত হোক না কেন এবং তা প্রাপ্তির জন্য যে পথ বা উপায়ই অবলম্বন করা হোক না কেন তা সবই হারাম।

মনে রাখা দরকার, যে সময়ে রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার আয়াত নাযিল হয়েছিল সে সময়ে আরব সমাজে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে প্রদত্ত ঋণের উপর সূদ আদায় করা হ'ত, তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপরও সূদ গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল। এই উভয় প্রকার সূদকেই তখন আরবী ভাষায় 'রিবা' বলা হ'ত এবং কুরআনে এই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সূদের বৈশিষ্ট্যঃ

এই আলোচনা হ'তে সূদের চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হ'ল-

(ক) সূদের উদ্ভব হয় ঋণের ক্ষেত্রে।

(খ) ঋণ পরিশোধের সময়ে পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।

(গ) প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ ও গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য একটা সময়সীমা ঋণগ্রহণের সময়েই নির্ধারিত হবে।

(ঘ) ঋণগ্রহীতার কোন ক্ষয়-ক্ষতি, লাভ-লোকসান বা ঝুঁকি কোনভাবেই বিবেচনার বিষয় বলে গণ্য হবে না।

সূদের প্রকারভেদঃ

ইসলামী শরী'আহ অনুসারে রিবা দুই ধরনের (ক) রিবা আন-নাসিআহ (الربوا النسيئة) ও (খ) রিবা আল-ফাযল (الربوا الفضل)।

(ক) **রিবা আন-নাসিআহ** হ'ল বাকীতে ঋণের সূদ। অর্থাৎ ঋণের সেই মেয়াদকালকে বলা হয়, যা ঋণদাতা মূল ঋণের উপর নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে ঋণগ্রহীতাকে নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ,

২. T.B. Hughes, *A Dictionary of Islam,* (Premier Book House, 1985), p. 544*;* Adam Kupar & Jessica Kupar, *The Social Sciences Encyclepaedia,* (Routledge & Kegam paul, 1985), p. 405-406; *Encylopaedia Judiace,* (Jerusalem, 1972), Vol. 16. p. 28; Raymond De Rover, International Encydopaedia of the Social Sciences, London, vol. 4, p. 434; Henry, W. Spigel, *A Dictionary of Economics, (*Macmillan, 1987), Vol. IV, p. 769.

ক এক বছরের জন্য খ-কে টাঃ ১০০/- দিল এই শর্তে যে সে তাকে টাঃ ১০০/- এর সাথে অতিরিক্ত আরও ১০/- যোগ করে ফেরৎ দেবে। এই অতিরিক্ত টাঃ ১০/-ই হ'ল 'রিবা আন-নাসিআহ' বা প্রতীক্ষার সূদ।

(খ) **রিবা আল-ফাযলের** উদ্ভব হয় পণ্যসামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশী পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হ'লে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় **রিবা আল-ফাযল**। 'ফাযল' অর্থ অতিরিক্ত।

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা বিলাল (রাঃ) রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সমীপে কিছু উন্নত মানের খেজুর নিয়ে হাযির হ'লেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। আমি তার দুই ছা'-এর বিনিময়ে এক ছা' উন্নতমানের 'বারমী' খেজুর বদলিয়ে নিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ওহ! এতো নির্ভেজাল সূদ, এতো নির্ভেজাল সূদ। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহ'লে নিজের খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর উন্নতমানের খেজুর কিনে নেবে'।[৩]

অন্য এক হাদীছে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্র হাতে হাতে। যে ব্যক্তি বেশী দিয়েছে বা নিয়েছে সে সূদী কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান'।[৪]

তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। এর অন্তর্নিহিত কারণ হ'ল তাৎক্ষণিক স্থানীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষে সুবিচার ও যথাযথ বিনিময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। তাই শরী'আতের হুকুম হ'ল নির্ধারিত পণ্যটি প্রথমে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে হবে।

৩. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১৪।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯।*

সূদ ও মুনাফার পার্থক্যঃ

অনেকে সূদ ও মুনাফাকে একই মাপকাঠিতে বিচার করেন। এমনকি ‘সূদ তো মুনাফার মতই’ এতদূর পর্যন্তও বলতে কছূর করেন না। এজন্যই এ দু’য়ের পার্থক্য সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে নীচে তুলে ধরা হ’ল।

(ক) সূদ হ’ল ঋণের শর্ত অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ঋণদাতাকে মূল অর্থের সাথে প্রদেয় অতিরিক্ত অর্থ। পক্ষান্তরে মুনাফা হ’ল উৎপাদনের মূল্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য।

(খ) সূদ পূর্ব নির্ধারিত। অপরপক্ষে মুনাফা অর্জিত হয় পরে।

(গ) সুদে কোন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই। অপরপক্ষে কোন উদ্যোগে বা কারবারে মুনাফা না হয়ে লোকসানও হ’তে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী এবং উদ্যোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রেই ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

(ঘ) সূদ কখনই ঋণাত্মক হ’তে পারে না। বড় জোর খুবই কম বা তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হ’তে পারে। মুনাফা ধনাত্মক, শূন্য এমনকি ঋণাত্মক (অর্থাৎ লোকসান) হ’তে পারে।

(ঙ) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা উদ্যোক্তা ও পুঁজির যোগানদাতার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল।

অন্যান্য ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সূদঃ

কুরআন নাযিলের পূর্বে অন্যান্য যেসব আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছিল, সেসবেও সূদ নিষিদ্ধ ছিল। ঐসব গ্রন্থ আজ আর অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। একমাত্র আল-কুরআনই রয়েছে অবিকৃত অবস্থায়, থাকবেও ক্বিয়ামত পর্যন্ত। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। দাঊদ (আঃ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ ‘যাবূর’-এর কোন সন্ধান মেলে না। মূসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া ‘তাওরাত’ ও ঈসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হওয়া ‘ইনজীল’-এর যে বহু বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যুগে যুগে, একথা তো সর্বজনবিদিত। তারপরও ইনজীল বা বাইবেলের ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’ বা আদিপুস্তক তাওরাতেরই অংশবিশেষ বলে ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞগণ দাবী করেন। সেই আদিপুস্তকেই সূদ সম্বন্ধে যে ঘোষণা ও নির্দেশনা রয়েছে তা এ যুগের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণত (১) ‘তুমি যদি আমার

প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুঃখীকে টাকা ধার দাও তবে তাহার কাছে সূদগ্রাহীর ন্যায় হইও না; তোমরা তাহার উপর সূদ চাপাইবে না’ *[(Exodus) যাত্রাপুস্তক; ২২: ২৬]*। (২) ‘তুমি তাহা হইতে সূদ কিংবা বৃদ্ধি লইবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে ভয় করিবে... তুমি সূদের জন্য তাহাকে টাকা দিবে না’ *[(Exodus) লেবীয় পুস্তক, ২৫: ৩৬-৩৭]*। (৩) ‘তুমি সূদের জন্য, রৌপ্যের সূদ, খাদ্য সামগ্রীর সূদ, কোন দ্রব্যের সূদ পাইবার জন্য আপন ভ্রাতাকে ঋণ দিবে না’ *[(Deuteronomy) দ্বিতীয় বিবরণ, ২৩: ১৯]*। (৪) ‘যে সূদ ও বৃদ্ধি লইয়া আপন ধন বাড়ায়... তাহার প্রার্থনাও ঘৃণাস্পদ’ *[(Ecclesiaftes) হিতোপদেশ, ২৮: ৮-৯]*। (৫) ‘যে সূদের জন্য টাকা ধার দেয় না... সে কখনও বিচলিত হইবে না’ *[(Psalm) গীতসংহিতা, ১৫: ৬]*। (৬) ‘পরন্তু কোন ব্যক্তি যদি ধার্মিক হয়... সূদের লোভে ঋণ দেয় নাই, কিছু বৃদ্ধি লয় নাই... তবে সেই ব্যক্তি ধার্মিক, সে অবশ্য বাঁচিবে’ *[(Ezikel) যিহিস্কেল, ১৮: ৮-৯]*। (৭) ‘যদি সূদের লোভে ঋণ দিয়া থাকে ও বৃদ্ধি লইয়া থাকে তবে সে কি বাঁচিবে? সে বাঁচিবে না; সে এই সকল ঘৃণার্হ কার্য করিয়াছে’ *[(Ezikel) যিহিস্কেল, ১৮: ৯৩]*।

খৃষ্টধর্মের শুরু হ’তে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হ’তে অন্যান্য চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সূদ নিষিদ্ধ ছিল। সকল চার্চই তখন এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করত। মধ্যযুগে ইউরোপের চার্চ অপরিসীম লোভ ও কৃপণতার জন্য সূদখোরদেরকে দেহপসারিণীদের সমতুল্য গণ্য করেছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রখ্যাত দার্শনিক ও সমাজহিতৈষী ব্যক্তিগণও সূদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তারা সূদের অশুভ পরিণতি তুলে ধরেছেন এবং সূদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন। **এ্যারিস্টটল** তাঁর *Politics* গ্রন্থে সূদকে কৃত্রিম মুনাফা আখ্যায়িত করে বলেছেন যে, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থ ক্রয়-বিক্রয় করা এক ধরনের জালিয়াতি। সুতরাং সূদের কোন বৈধতা থাকতে পারে না। **প্লেটো** তাঁর *Laws* নামক গ্রন্থে সূদের নিন্দা করেছেন। **থমাস একুইনাস** সূদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, অর্থ থেকে অর্থের ব্যবহারকে পৃথক করা যায় না। তাই অর্থের ব্যবহার করা মানে অর্থ খরচ করে ফেলা। এক্ষেত্রে একবার অর্থের ব্যবহারের মূল্য নেয়ার পর অর্থাৎ মুনাফা গ্রহণের পর

পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া হলে একই দ্রব্য দু'বার বিক্রি করার অপরাধ হবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি অবিচার'। সূদকে সময়ের মূল্য বলে যারা দাবী করেন তাদের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ যার উপর ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকলেরই সমান মালিকানা বা অধিকার রয়েছে। এ অবস্থায় শুধু ঋণদাতার সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি অসাধু ব্যবসা বলে অভিহিত করেছেন। **হিন্দু ধর্মেও** সূদ গ্রহণকে সমর্থন করা হয়নি *(মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং ১০২)*।

পুঁজিবাদের কঠোর সমালোচক এবং সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক প্রবক্তা **কার্লমার্কসও** সূদ ও সূদখোরদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন (দ্রঃ *Capital.* Vol. 2)। তিনি অর্থনীতি হ'তে সূদ উচ্ছেদ, সূদখোরদের কঠোর শাস্তি প্রদান ও তাদের সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। অর্থ বা মুদ্রাকে তিনি সমাজ শোষণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করেছেন। এজন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে (১৯১৮-২২) পুঁজিবাদী অর্থনীতি উৎখাতের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে রাশিয়ার মুদ্রা রুবল পর্যন্ত অর্থনৈতিক লেনদেন হ'তে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।[৫]

পল মিলস ও জন প্রিসলে বলেন, ইতিহাসের কালপরিক্রমায় দেখা যায় অন্যের দুর্ভাগ্য হ'তে 'মুনাফা' অর্জনের জন্য ইহুদী সূদখোরদের নিন্দা করা হয়েছে। **প্লুটার্ক** বিশ্বাস করতেন বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে অর্থ ঋণদানকারীরা অধিক নির্যাতনকারী। সূদখোররা তাদের প্রবাদতুল্য অর্থগৃধ্নুতা, নিষ্ঠুরতা ও অর্থলোলুপতার জন্য বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনায় বিদ্রূপের খোরাক হয়ে রয়েছে। ইতালীর অমর কবি **দান্তে** সূদখোরদের নরকের অগ্নিবৃষ্টিময় সপ্তম বৃত্তে নিক্ষেপের কথা বলেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অবিসংবাদিত **সেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস'** নাটকের শাইলক ও **মলিয়ের 'দি মাইজার'** নাটকের হারপাগণের নাম কে না শুনেছে? বাংলা সাহিত্যেও গল্প-উপন্যাসে সূদখোরদের শোষণ-পীড়নের কাহিনীর উল্লেখ একেবারে অপ্রতুল নয়। **রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', শওকত ওসমানের 'ইতা'** প্রভৃতি গল্পই তার প্রমাণ।

৫. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য E.H. Carr- The Bolshevik Revolution, Vol. 2, Ch. 17; Macmillan, 1952.

সূদ ও ইসলামঃ

সূদ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান সবচেয়ে কঠোর ও অনমনীয়। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বেই সূরা বাক্বারাহতে আল্লাহ্র ঘোষণা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সূরাতেই আরও বলা হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং সূদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না করো তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ। আর যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন ফিরিয়ে নিতে পারবে। না তোমরা যুলুম করবে, না তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*।

ক্বিয়ামতের দিন সূদখোরদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে ঐ সূরাতেই বলা হয়েছে, 'যারা সূদ খায় তারা ক্বিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে যেভাবে দণ্ডায়মান হবে ঐ ব্যক্তি যার উপর শয়তান আছর করে। তাদের এ অবস্থার কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো সূদ নেওয়ারই মতো' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

সূদের লেনদেন ও সূদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং এরা অপরাধের ক্ষেত্রে সকলেই সমান'।[৬]

পবিত্র কুরআনে বহু ধরনের গুণাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। সেসবের জন্য কঠোর শাস্তি ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু সূদের ক্ষেত্রে যত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে অন্য কোন গুনাহের ব্যাপারে এমনটি করা হয়নি। এজন্যই সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সূদ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাসূলে করীম (ছাঃ) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে তিনি যে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেন তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখে পাঠান- 'যদি তোমরা সূদী কারবার করো তাহ'লে তোমাদের সাথে চুক্তি ভেঙ্গে যাবে এবং আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে'। বনু মুগীরার সূদী লেনদেন সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের প্রাপ্য সমুদয় সূদ বাতিল করে দেন এবং মক্কায় তাঁর নিযুক্ত তহসীলদারদেরকে লিখে পাঠান, যদি তারা (বনু মুগীরা) সূদ গ্রহণ করা বন্ধ না করে তাহ'লে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।

৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭*।

রিবার অবৈধতা আল-কুরআনের সাতটি আয়াত (বাক্বারাহ ২৭৫-২৭৬, ২৭৮-২৮০; আলে ইমরান ১৩০ এবং রুম ৩৯) এবং চল্লিশটিরও বেশী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ তুলে ধরা হ'ল-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের (পাপের) সত্তুরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তর হ'ল মায়ের সাথে যেনা করার পাপ'।[৭]

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) রিবা বা সূদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে তার পাপ ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক বেশী হয়'।[৮]

(৩) কূফার ক্বাযী খ্যাতনামা তাবেঈ আবু বুরদা বিন আবু মূসা বলেন, আমি মদীনায় এলাম এবং ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম। তখন তিনি বললেন, তুমি এমন এক এলাকায় বাস কর, যেখানে সূদ ব্যাপক হারে প্রচলিত। অতএব যদি কারু নিকট তোমার কোন পাওনা থাকে, আর সে যদি তোমার নিকট এক থলে ভূষি বা যব কিংবা এক আঁটি ঘাসও উপঢৌকন দেয়, তবুও তুমি তা গ্রহণ করো না। কেননা ওটা হবে 'রিবা' বা সূদ'।[৯]

(৪) হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অভিশাপ করতে শুনেছেন সূদখোরের প্রতি, সূদ দাতার প্রতি, সূদের প্রমাণপত্র লেখকের প্রতি ও ছাদাক্বা প্রদানে বাধাদানকারীর প্রতি। আর তিনি নিষেধ করতেন মৃতের জন্য বিলাপ করা হতে'।[১০]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা।[১১]

উপরোল্লিখিত হাদীছ সমূহ থেকে সূদ সম্পর্কে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। এসবের মধ্যে রয়েছে সূদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা মহাপাপী বলে গণ্য হবে। সামান্য বিষয় এমনকি ঋণদাতাকে উপহার প্রদানও সূদ হিসাবে বিবেচিত হবে। সূদের শেষ পরিণতি হবে নিঃস্বতা। সূদ বহু প্রকারের হ'তে পারে।

৭. *ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৮২৬।*
৮. *মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ ।*
৯. *বুখারী, মিশকাত হা/২৮৩৩।*
১০. *নাসাঈ, মিশকাত হা/২৮২৯,শাওয়াহেদ-এর কারণে হাদীছ ছহীহ।*
১১. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ।*

এক সময়ে সূদ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করবে এবং তা থেকে কারো রেহাই থাকবে না। সূদের গুনাহ (যা কবীরা গুণাহ) অতীব নিকৃষ্ট ধরনের ইত্যাদি। তাই সূদ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজদেহ হ'তে সূদ উচ্ছেদ ও রহিত করার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণও সমান প্রয়োজন।

বিশ্বমানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবনের সর্বশেষ ভাষণেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে ভুলেননি। তিনি যে প্রকৃতই রহমাতুল্লিল আলামীন, তাঁর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণেও তার পরিচয় রেখে গেছেন। অবিস্মরণীয় সেই ভাষণে তিনি একটিমাত্র ঘোষণার মাধ্যমে শোষণের বিষদাঁত চিরতরে ভেঙ্গে দিলেন। অবিচল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, 'জাহেলী যুগের সমস্ত সূদ বাতিল করা হ'ল। সবার আগে আমাদের গোত্রের আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের সব সূদ আমিই রহিত করে দিলাম'।[১২]

সেই ঘোষণার ফল হয়েছিল সূদূরপ্রসারী। উমাইয়া ও আব্বাসীয় খিলাফত পরবর্তী যুগেও বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী এক বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ নয়শত বছর ইসলামী হুকুমত বহাল থাকাকালীন কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না। সূদের মাধ্যমে কোন লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি। পরবর্তীতে মুসলমানদের ভোগবিলাস ও আত্মবিস্মৃতির সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের পরাভূত করে ধ্বংস করে দেয় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনের উপায়-উপকরণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ। বিপরীতে মুসলিম দেশ ও সমাজ কোন প্রতিরোধ তো গড়তে পারেইনি বরং ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ে যোজন যোজন পথ। এই সময়েই ইউরোপে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে নতুন আঙ্গিকে সূদ পুনরায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বের সকল দেশে, সমাজের সর্বস্তরে। ব্যাংকিং পদ্ধতির বিকাশ ঘটে শিল্প বিপ্লবের হাত ধরেই। ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমেই সমাজে সূদের সর্বনাশা শোষণ ও ধ্বংস আরও গভীর ব্যাপ্তি লাভ করে। একদিকে পুঁজি আবর্তিত হ'তে থাকে শুধু ধনীদের মধ্যেই, যা পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে সূদের কারণে আরও নতুন নতুন অর্থনৈতিক নির্যাতন ও শোষণ বিস্তৃতি লাভ করে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে, যার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ আজ আর সহজসাধ্য নয়॥

১২. *তারীখে ত্বাবারী; সীরাতে ইবনে হিশাম।*

সূদের কুফলঃ

সূদের কুফল বহুবিধ। যেমন-

১. সূদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

২. সূদের কারণে দরিদ্র আরও দরিদ্র এবং ধনী আরও ধনী হয়।

৩. সূদের শোষণ সার্বিক, ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রকৃতির।

৪. সূদ গ্রহীতারা প্রায়শঃই স্বার্থপর, কৃপণ ও চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়।

৫. সূদের নিশ্চিত উপার্জন সূদখোরকে শ্রমবিমুখ ও অলস করে।

৬. সূদের ফলে একচেটিয়া কারবারের প্রসার ঘটে।

৭. সূদের কারণে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই বৃহৎ পুঁজি আবর্তিত হয়।

৮. সূদ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৯. সূদের দীর্ঘমেয়াদী কুফল স্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হয়।

১০. সূদ পূর্ণ কর্মসংস্থানেরও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক।

১১. সূদের জন্যই দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়।

১২. সূদ স্বল্প লাভজনক সামাজিক প্রয়োজনীয় খাতে বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

১৩. সূদের কারণেই ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প লাভজনক হ'তে পারে না।

১৪. সূদ সাধারণ জনগণের বিত্ত স্বল্প সংখ্যক পুঁজিপতির হাতে পুঞ্জীভূত করে।

১৫. সূদ সৃজনশীল উদ্যোগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১৬. সূদ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে।

১৭. সূদ মজুরী বৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক।

১৮. সূদ ধনবণ্টনে অসমতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

১৯. সূদ মুদ্রাস্ফীতিতে প্রত্যক্ষ ইন্ধন যোগায়।

২০. সূদের কারণেই ধনী ও দরিদ্র দেশের সম্পর্ক শোষক ও শোষিতের পর্যায়ে উপনীত হয়। এসব ছাড়াও সূদের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কুফল রয়েছে। সেগুলি আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

পরিত্রাণের উপায়ঃ

সূদের এই সর্বগ্রাসী সয়লাব, এর বিধ্বংসী কুফলসমূহ হ'তে উদ্ধার লাভের উপায় কি? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ নয়শত বছরে মুসলিম বিশ্বে কোথাও সূদ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের পতনদশা শুরু হ'লে যখন পাশ্চাত্যের ধনবাদী আগ্রাসী শক্তিসমূহ একে একে মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করতে শুরু করে, তখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয় চরম নাজুক অবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, ভূ-সম্পত্তি সবই চলে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের দখলে। এই সময়েই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সূদের বিস্তার শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে যখন এসব দেশ পুনরায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সূদ গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে। সূদ উচ্ছেদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কোন প্রচেষ্টাও চলেনি। অর্থবহ কোন জোরদার কর্মসূচীও গৃহীত হয়নি। সূদ উচ্ছেদের জন্য মাত্র বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ইসলামী পদ্ধতির ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এরপরও বাংলাদেশের মত বহু মুসলিম দেশে সূদ অর্থনৈতিক-সামাজিক ও প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে দাপটের সাথে বিরাজমান। কিভাবে একে সমাজদেহ হ'তে উচ্ছেদ করা যায়, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হ'তে কিভাবে চিরতরে দূর করা যায়, এক কথায় সূদ বর্জনের কৌশল কি হ'তে পারে সে সম্বন্ধে এখানে বাস্তবধর্মী কিছু কর্মসূচী আলোচিত হ'ল।-

সামাজিক কর্মসূচী

১. গণসচেতনতা সৃষ্টিঃ

সূদ বর্জনের তথা সমাজ হ'তে সূদ উচ্ছেদের জন্য গণসচেতনতা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এদেশের জনগণের প্রায় ৮৫% লোক মুসলমান। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু যথার্থ ইসলামী জ্ঞানের অভাবে সূদ যে ইসলামে সর্বৈব হারাম সে সম্বন্ধে অনেকেই জ্ঞাত নয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ নির্দেশ চৌদ্দশত বছর আগে ঠিক ছিল, এখন নয় (নাঊযুবিল্লাহ)। তাদের যুক্তি, ব্যাংকের সূদ ও ব্যক্তির দাবীকৃত সূদ একই পর্যায়ের বিবেচিত হ'তে পারে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভবই হয়নি। আবার একদল বলেন, আরবী 'রিবা' এবং ইংরেজী

Interest একই অর্থ বহন করে না। অথচ আভিধানিক ও ব্যবহারিক বিচারে রিবার যে অর্থ ইংরেজী Interest-এর ব্যবহারিক অর্থ একই দাঁড়ায়। আল-কুরআনে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম' *(বাক্বারাহ, ২৭৫)*। দেশের সাধারণ জনগণের বিপুল অংশ প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনের এই নির্দেশ সম্বন্ধে অবগত নয়। এজন্যই তাদের কাছে এই ইলাহী নির্দেশ যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা অতীব যরূরী। সূদের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে প্রথমেই যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা দরকার তা হ'ল সূদের আয় যেমন হারাম, সূদের সঙ্গে যেকোন ধরনের সংশ্লিষ্টতাও তেমনি হারাম এবং হারাম উপায়ে উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ– 'তোমাদের মধ্যে যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয় তাদের সকলের উপর আল্লাহ্র লা'নত'।[১৩] ছহীহ হাদীছ অনুসারে আল্লাহ্র কাছে দো'আ কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তগুলো রয়েছে তার অন্যতম হ'ল হালাল রূযীর উপর বহাল থাকা।[১৪]

সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি আমাদের উপার্জনই হালাল না হয় তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে যতই ফরিয়াদ করি না কেন তা কবুল হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই।

সেক্ষেত্রে আমাদের সকল ইবাদত বন্দেগীই বরবাদ হয়ে যাবে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হ'ল আখিরাতে আল্লাহ্র আযাব হ'তে রেহাই না পাওয়া। তাই ঈমান বজায় রাখার স্বার্থেই আমাদের হালাল রূযী অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যা হারাম তা পরিত্যাগে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জনের মধ্যেই রয়েছে মুমিন জীবনের যথার্থ সাফল্য। এই সাফল্য অর্জনের জন্য চাই নিরন্তর প্রয়াস। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই কেবল সূদ উচ্ছেদের লক্ষ্য অর্জিত হ'তে পারে। জনগণের চাহিদা এবং তার দৃঢ় বহিঃপ্রকাশ ছাড়া সরকার নিজ থেকে খুব কমই তাদের উপযোগী

---

১৩. *মুসলিম, হা/১৫৯৮; তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত হা/২৮০৭।*

১৪. *মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০।*

ও প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকে। তাই সূদ উচ্ছেদের কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এজন্য সবার আগে চাই গণসচেতনতা। আমাদের দেশের জনগণের একটা অংশ এখনও শিক্ষিত নয়। তাই কাজটা একটু কঠিন ও আয়াসসাধ্য, তবে অসম্ভব নয়। কারণ এদেশের জনগণ ধর্মভীরু। তাদের যদি যথাযথভাবে ইসলামের দাবী কি এবং তা অর্জনের উপায় কি এটা বোঝানো যায়, প্রকৃতই উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহ'লে এদেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় সূদ বর্জন সময়সাপেক্ষ হ'তে পারে। কিন্তু অসম্ভব নয়। এজন্য কতকগুলি উপায় অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রথমত: মসজিদে জুম'আর খুৎবার সাহায্য গ্রহণ। বছরে বায়ান্ন দিন এলাকার জনগণ মসজিদে জুম'আর ছালাতে শামিল হন। এই ছালাতের খুৎবায় নানা বিষয়ের অবতারণা করা হয়। সেসব বিষয়ের পাশাপাশি যদি খতীব বা ইমাম ছাহেব সূদী অর্থনীতির কুফল এবং তা দেশ ও জাতির জন্য কতখানি ক্ষতিকর তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন, তাহ'লে ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

দ্বিতীয়ত: দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ায মাহফিল ও ইসলামী জালসায় ওলামায়ে কেরামগণ বক্তৃতা করে থাকেন। সেখানে হাযার হাযার লোকের সমাগম হয়। ঐসব অনুষ্ঠানে যদি ইসলামী অর্থনীতির কল্যাণময় দিক এবং সূদী অর্থনীতির কুফল সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে বক্তব্য রাখা যায় তাহ'লে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, জনমত গড়ে উঠবে তার ধাক্কাতেই সূদী অর্থনীতি উৎখাত হ'তে পারে, বাস্তবায়িত হ'তে পারে ইসলামী অর্থনীতি।

তৃতীয়ত: দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং। সূদের অপকার সম্বন্ধে আমজনতাকে ওয়াকিফহাল তথা সচেতন করে তুলতে হ'লে দেওয়াল লিখন ও পোস্টারিং একটা মোক্ষম উপায়। এর মাধ্যমে সহজেই সূদের ভয়াবহ কুফল ও হালাল রূযীর অপরিহার্যতা সম্বন্ধে মোটা দাগে প্রয়োজনীয় কথাগুলো সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা যায়। সুন্দর ডিজাইনে বড় বড় হরফে ছাপা পোস্টার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। একইভাবে দেওয়াল লিখনের চমৎকার শ্লোগানগুলো দাগ কেটে বসবে লোকের মনে। পৃথিবীর সকল দেশেই বিশেষতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক

গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও খোদ সরকারই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে। ফলও পাচ্ছে হাতে হাতে।

চতুর্থতঃ রেডিও-টিভিতে নাটিকা, কথিকা ও আলোচনা অনুষ্ঠান ও টকশো প্রচলনের ব্যবস্থা গ্রহণ। বর্তমানে টেলিভিশনের প্রভাব বিপুল হ'লেও রেডিওর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়নি। বিশেষতঃ নদী, খাল, বিল পরিবেষ্টিত ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত পল্লী বাংলায় রেডিও এখনও বিপুলভাবে সমাদৃত গণমাধ্যম। তাই সূদের শোষণ ও নানাবিধ কুফল সম্পর্কেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'তে পারে রেডিও এবং টিভি থেকে। বাংলাদেশে এখন অনেক বেসরকারী রেডিও ও টিভি চ্যানেল রয়েছে। ইসলামী আদর্শ অনুসারী অনেক প্রোগ্রামও প্রচারিত হয় এসব গণমাধ্যম হ'তে। সেসব প্রোগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় এ ধরনের অনুষ্ঠান। এর মাধ্যমে অগণিত দর্শকশ্রোতার কাছে উপভোগ্যভাবে হারাম উপার্জন ও তার ভয়াবহ পরিণামের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সূদের অপকার সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হ'তে পারে। টকশোর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রাঞ্জলভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করলে অজস্র মানুষ এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারতো, উপকৃত হ'তে পারত। তাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ত। পরিণামে সূদ পরিত্যাগের জন্য তাদের অনেকেই যে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নিতো নিঃসন্দেহে সে আশা করা যায়।

পঞ্চমতঃ পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও উপসম্পাদকীয় প্রকাশ। দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকায় সূদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতাবিধ্বংসী প্রসঙ্গসমূহ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নিয়মিত বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হ'তে থাকলে তা যেমন গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে তেমনি গণজাগরণেরও আবহ তৈরী হবে। একই উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে, দেশের কর্ণধারদের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে উপসম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হ'তে পারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দৈনিক ইত্তেফাকের *'রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ'* এই ধরনের ভূমিকাই রেখেছিল। দেশে এখন ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সেসব দৈনিক এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসলে তা হবে প্রশংসনীয় এক বিরাট খিদমত।

২. আখেরাতে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করাঃ

মুসলমানদের জীবনে রয়েছে দু'টি পর্ব- ইহকাল ও পরকাল বা আখেরাত। পরকালের জীবনটাই অনন্ত, ইহকালের জীবন ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর। পরকালের জীবনে রয়েছে অপরিমেয় পুরস্কার অথবা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ নির্দেশিত পথে ইহকালে জীবন যাপন করলে যেমন আখেরাতে রয়েছে আনন্দময় জীবন, তেমনি সেই নির্দেশের পরিপন্থী জীবন যাপনের জন্য রয়েছে অনন্ত দুঃখভোগ। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, خَالِدِيْنَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 'অনন্ত কাল জাহান্নামে সেই দুঃখভোগ চলতে থাকবে এবং জাহান্নাম নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম স্থান' *(তাগাবুন ১০)*। যেসব কারণে আখেরাতে বনী আদমকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হ'তে হবে, তার অন্যতম হ'ল হারাম পন্থায় উপার্জন ও হারাম বস্তু ভোগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُـــذِّىَ بِـــالْحَرَامِ، 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, যা হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত'।[১৫] হারাম খাদ্য শুধু হারাম বস্তু হ'তেই তৈরী হয় না, হারাম উপার্জন হ'তে সংগৃহীত খাদ্যও হারাম বলেই গণ্য হবে। সূদ-ঘুষ, চুরি-দুর্নীতি, টেন্ডারবাজি, জালিয়াতি, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, জুয়া, ফটকাবাজারী, প্রতারণা প্রভৃতি সবই ইসলামে হারাম। এসব হারাম পন্থায় উপার্জন করা বা বিত্তবান হওয়া যেমন হারাম তেমনি ঐ উপার্জন বা বিত্ত-সম্পদ ভোগ বা ব্যবহার করাও হারাম। পূর্বেই বলা হয়েছে হালাল রূযী দো'আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হারাম উপার্জন আখেরাতে আমাদের কোন কাজে তো আসবেই না, উল্টো এর পরিণামফল হবে ভয়াবহ। এজন্যই অন্যান্য সব হারাম উপার্জনের মতো সূদও অবশ্যই বর্জন করতে হবে। সূদ খাওয়ার পাশাপাশি সূদের হিসাব লিখে ও সাক্ষ্য দিয়েও উপার্জন করা সম্ভব। এই পথও বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ কোন প্রকারেই সূদের সাথে কোনরূপ সংস্রব রাখা চলবে না।

তা না হ'লে এই আয়ের জন্য, এই আয়ে জীবন ধারণের জন্য আখেরাতে ভয়াবহ ও ভীতিকর শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। জনগণের মধ্যে এই চেতনা,

---

১৫. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২৭৮৭; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬০৯।*

এই বোধ জাগিয়ে তোলা অতীব যরূরী। এ দেশের আমজনতার মধ্যে ইসলামপ্রীতি ঈর্ষণীয়। কিন্তু এদের বিপুল অংশই ইসলামের মূল যে দাবী *আমর বিল মারূফ* ও *নাহী আনিল* মুনকারের অনুসরণের মাধ্যমেই যে আল্লাহ্‌র ইবাদত বা তাঁর বন্দেগী হয়, সে সম্বন্ধে প্রায় অনবহিত বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন অজস্র লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস শুধু এগুলো পালন করলেই একজন মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছে স্বীকৃত হবে এবং আখেরাতে নাজাত পেয়ে যাবে। আয়-রোযগার, ব্যয়, ভোগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ কি সে সম্বন্ধে না তারা জানার চেষ্টা করেছে, না সেসব আমলের ব্যাপারে সতর্ক হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হ'ল অত্যাবশ্যক কাজ।

হালাল রূযী উপার্জনের ব্যাপারে, হালাল খাদ্য ও হালাল সামগ্রী ভোগের ব্যাপারে খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, এমনকি ইমামগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন সে খবর আমরা কতজন রাখি? অথচ সেইসব উদাহরণই হওয়া উচিৎ ছিল আমাদের পালনীয় আদর্শ। বহু লোক আখেরাতকে ভয় করলেও আখেরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে হয় অনবহিত, নয়তো গাফেল বা অসতর্ক। বর্তমানের প্রয়োজনের অজুহাতে অথবা শয়তানের কৌশলী প্রতারণা বা প্ররোচণার বশীভূত হয়ে তারা দুনিয়া তথা এর সম্পদ ও ভোগবিলাস অর্জনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। ফলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার তার কাছে গৌণ বা তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভ্রান্তি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সূদের কারবার করে, সূদের লেনদেন করে, সূদী উপার্জনের অর্থেই এই উদ্দেশ্যে হজ্জ করতে যায় যে, হজ্জের কারণে আল্লাহ তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দিবেন। অথচ ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ এর বিপরীতটাই।

৩. পাঠ্যসূচীতে ইসলামী অর্থনীতি চালু করাঃ

বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু জনগণের তথা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এই যে, দেশের স্কুল-কলেজের শিক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তাদের ঈমান ও আক্বীদার কোন সংশ্রব নেই। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রাথমিক

ও মাধ্যমিক স্তরে প্রবর্তিত ইসলামী শিক্ষার কথা বাদ দিলে উচ্চতর শিক্ষা এবং বিশেষ শিক্ষার কোন পর্যায়েই ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা জানারই কোন সুযোগ নেই। এই অবস্থার নিরসন হওয়া দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যসূচীতে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। এজন্য প্রয়োজন গোটা পাঠ্যসূচীর সংস্কার। যারা আগামী দিনে এদেশের প্রশাসন, বিচার, আইন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কল-কারখানার কর্ণধার হবে, তাদের যদি এখনই সূদী অর্থনীতির কুফল ও ধ্বংসাত্মক দিক সম্বন্ধে অবহিত করা না যায় এবং পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতির গঠনমূলক ও হিতকর দিকগুলো জানানো না যায়, তাহ'লে জাতি যে তিমিরে রয়েছে সেই তিমিরেই থেকে যাবে।

কিশোর বয়সেই যা শেখা যায়, যে বিষয়গুলো স্কুলের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে সারা জীবন তার প্রভাব রয়ে যায় মানুষের চিন্তা, চেতনা ও কর্মধারার উপর কখনো সচেতনভাবে কখনো অবচেতন মনে। সেজন্যই বিভিন্ন মতাদর্শের স্কুলের পাঠ্যসূচীর বিষয় নির্বাচন করা হয় যথেষ্ট সতর্কতার সাথে, প্রচুর যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-ভাবনার পর। সরকার পরিচালিত স্কুল ও কলেজসমূহের পাঠ্যক্রমে জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য, কল্যাণময় জীবন, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ সমাজ গঠনের জন্য যেসব মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য সেসব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর স্কুল পাঠ্যসূচী বা যেসব সিলেবাস অনুসরণ করা হয় সেগুলি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। আমাদের দেশেও বিগত দশকগুলিতে স্কুলের পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। দেশের মুক্তি সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী, বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনগাথা, বৃক্ষরোপন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল, এমনকি একেবারে সাম্প্রতিক কালে এইডসের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কেও আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে স্কুলের পাঠ্যসূচীতে।

অথচ গভীর পরিতাপের বিষয়, ইসলামী জীবনাদর্শ, আচরণ, ইসলামী শিক্ষা, অমর মুসলিম মনীষীদের জীবনকাহিনী এই পাঠ্যসূচীতে ঠাঁই করে নিতে পারেনি। ফলে লক্ষ লক্ষ শিশু, কিশোর-কিশোরীর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট হয়ে গড়ে ওঠার কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিকড়হীন জনসমর্থনহীন

বাকসর্বস্ব মুষ্টিমেয় এইসব বুদ্ধিজীবির সুকৌশলী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীতে যেন কোনক্রমেই ইসলামী জীবনাচরণ সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ না থাকে সেজন্য এরা প্রায়শই সেক্যুলার পাঠ্যসূচীর যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্ক পাঠ্যসূচীর অপরিহার্যতা ইত্যাকার চটকদার ব্যানারে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কসপের আয়োজন করে গৃহীত সুপারিশসমূহ জাতীয় দাবী শিরোনামে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে পেশ করে। একই সঙ্গে তাদের ঘরানার পত্রিকাগুলোও জোর সমর্থন দিয়ে যায়। ফলে সরকারের নীতি নির্ধারকরাও বিভ্রান্ত বা বিচলিত না হয়ে পারে না।

অথচ দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ঈমান-আক্বীদার সাথে সম্পর্কিত বিষয় স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ ছিল। ইসলামী জীবনাচরণ, হালাল উপার্জনের অপরিহার্যতা, যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুফল, সূদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর প্রসঙ্গ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা খুবই যরূরী।

৪. **সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি:**

সূদের মতো ভয়াবহ এক অক্টোপাসের নাগপাশ হ'তে মুক্তি লাভ করতে প্রয়োজন মযবূত সামাজিক প্রতিরোধ। যথাযথ সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলে বহু অন্যায়-অপকর্ম ও অসামাজিক কাজ হ'তে জনগণকে বিরত রাখা যায়। জনগণকে সত্যিকার উদ্বুদ্ধ করতে পারলে, সামাজিকভাবে সচেতন করতে পারলে বহু কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এদেশে বনায়ন কর্মসূচী তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। বছর ত্রিশেক পূর্বে দেশের অনেক এলাকায় মরুকরণের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। সেই সময়ে বৃক্ষরোপণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে জনমত তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়। রেডিও-টেলিভিশন সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান প্রচার ছাড়াও স্কুল-কলেজ মক্তব-মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের এই কাজে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গৃহীত হয়। একাজের সামাজিক স্বীকৃতি স্বরূপ শহর, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আজ তার সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

সূদ উচ্ছেদের জন্যে এ ধরনের জনমত গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। এক সময়ে এদেশের সমাজে সূদবিরোধী মনোভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ সমাজে সূদখোরদের দাপট চোখে পড়ার মতো। গ্রামাঞ্চলে সূদখোররা মহাজন

নামে পরিচিত। সূদী ব্যবসার কারণে সমাজপতিদের মধ্যেও তারা আসন করে নিয়েছে। শহরেও সূদের লেনদেনকারী ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিরা সকল কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। সূদকে আজ আর ঘৃণার চোখে দেখা হচ্ছে না। সুতরাং এর প্রতিবিধানের চেষ্টা না করলে এই সর্বনাশা পাপ ও সমাজবিধ্বংসী বিষ আরও ভয়াবহ রূপ নেবে। এজন্যেই প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ সৃষ্টি। এই প্রতিরোধ যতই ব্যাপক ও দুর্বার হবে সূদের নিস্পেষণ ততই আলগা হ'তে বাধ্য। ক্রমে এক সময়ে তা খসে পড়বে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হ'ল-

১. সূদখোরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। সমাজে যারা সূদখোর বলে পরিচিত, ধীরে ধীরে তাদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে। তারা যেন বুঝতে পারে যে, সূদের সঙ্গে সংশ্রব থাকার কারণেই জনগণ তাদের সঙ্গ বর্জন করছে বা তাদের এড়িয়ে চলছে। কাজটা কঠিন মনে হ'তে পারে কিন্তু সকলে মিলে এগিয়ে এলে মোটেই দুঃসাধ্য নয়।

২. সূদখোরদের জনপ্রতিনিধি না বানানো। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কোন কাজে সূদখোরদের নির্বাচিত হ'তে দেওয়া হবে না। তারা ভোটপ্রার্থী হ'লে যেন ভোট না দেওয়া হয় সেজন্য জোর প্রচারণা চালাতে হবে। জনগণকে বুঝাতে হবে এইসব লোকের কার্যক্রমের জন্যই সমাজে শোষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকবে।

৩. সূদখোরদের সামাজিকভাবে বয়কট করা। যারা সূদের ব্যবসা করে, গ্রামে মহাজনী কারবারের (গ্রামাঞ্চলে সূদী ব্যবসার প্রচলিত নাম) সাথে যারা যুক্ত তাদের ছেলে-মেয়ের সাথে নিজেদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে না দেওয়া এবং তাদের জানাযা না পড়ানোও উত্তম প্রতিষেধকের কাজ হ'তে পারে। বাংলাদেশেই আজ হ'তে পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলে সূদখোরের দাওয়াত কেউ সহজে গ্রহণ করতে চাইত না। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপটে এবং দ্বীনী শিক্ষা বঞ্চিত হওয়ার কারণে সেই অবস্থার দুঃখজনক পরিবর্তন ঘটেছে।

৪. ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। সরকার যেসব ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সূদ প্রদান বাধ্যতামূলক করে রেখেছে সেগুলো রহিত করার জন্য

ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। উদাহরণতঃ জমির খাজনা যথাসময়ে দিতে না পারলে তার উপর সূদ দিতে হয়। সূদের বদলে সরকার জরিমানা আরোপ করতে পারে। ঈমান ও আক্বীদাবিরোধী সূদ কেন দিতে হবে? অনতিবিলম্বে সরকার যেন খাজনার খাত থেকে সূদ প্রত্যাহার করে নিতান্তই অপরিহার্য ক্ষেত্রে জরিমানার ব্যবস্থা চালু করে সে লক্ষ্যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন।

উপরে উল্লিখিত কাজগুলো কঠিন নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুমিনের জীবনে কোন্ কাজটি সহজ? বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করে তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সমবেতভাবে এসব উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে।

৫. অনাবশ্যক সামাজিক ব্যয় প্রতিরোধ:

সমাজে বসবাস করতে হ'লে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে যেমন যোগ দিতে হয় তেমনি আয়োজনও করতে হয়। কিন্তু বিপত্তি বাধে যখন ঐ সব অনুষ্ঠান আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের প্রদশর্নী হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু অনেক অনুষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে চালু থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐসব অনুষ্ঠানের কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই। যেমন কেউ মারা গেলে মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনের মাথায় ধুমধাম করে দশগ্রামের বা মহল্লার লোকজন ডেকে খানাপিনার আয়োজন করা। ছেলের খাৎনা উপলক্ষ্যে বন্ধু-বান্ধব, পড়শী-স্বজন সকলকে ডেকে উৎসবমুখর পরিবেশ ও ভোজের আয়োজন এবং অভ্যাগতদেরকে উপঢৌকন প্রদানে বাধ্য করা। এছাড়াও রয়েছে জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ-বার্ষিকী প্রভৃতি নানা বিদ'আতী অনুষ্ঠান। রয়েছে বিচার আচার ও শালিশী বৈঠক। এসব বৈঠকের জন্য যে প্রচুর ব্যয় হয় তা বলাই বাহুল্য। বিয়ে-শাদীর কথা তো না বলাই ভাল। ইসলামের এই অপরিহার্য ও সরল সামাজিক অনুষ্ঠানটিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণে ঢুকে পড়েছে পান-চিনি বা পাত্র দেখা, গায়ে হলুদ, বিয়ের তত্ত্ব পাঠানো এবং রয়েছে ঘৃণ্য যৌতুক প্রথা। সম্প্রতি যৌতুকবিরোধী মনোভাব দানা বেধে ওঠার প্রেক্ষিতে একে গিফট বা উপঢৌকনের লেবাস পরানো হয়েছে।

একজন বিত্তশালী ব্যক্তি অক্লেশে এসব অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে নতুন বিত্তশালী বা হঠাৎ করে ধনী হওয়া লোকেরা সামাজিক পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভের জন্য তাদের অর্জিত নতুন বিত্ত খরচ করেন অকাতরে। সমস্যার সৃষ্টি হয় যখন একই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বলা হয় মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কাউকে। সমাজপতিরা রায় দেন- এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটা দিতে হবে। না হ'লে সমাজচ্যুত হ'তে হবে। অথচ এসবের ব্যয়ভার বহনের সাধ্য তার নেই। নিরুপায় হয়ে তখন তাকে সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হয় অথবা ঋণ নিতে হয় সূদ দেবার শর্তে। সাধারণতঃ এসব সামাজিক প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের সূদের হার বেশ চড়া হয়ে থাকে। কারণ ঋণদাতা ভাল করেই জানে যে, ঋণ গ্রহীতার বিকল্প কোন উপায় নেই। সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বাধ্য হয়ে নেওয়া এই ঋণ অতি অবশ্যই অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতের। ফলে তা পরিশোধ করা হয়ে দাঁড়ায় আরও দুরূহ। তাই ঋণের বোঝা চেপে বসে গ্রহীতার মাথায় জগদ্দল পাথরের মতো। শেষ অবধি তাকে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু, এমনকি ভিটেমাটি পর্যন্ত বেচে দিতে হয় ঋণ পরিশোধের জন্য। এই পথে গ্রাম বাংলার হাযার হাযার মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়েছে। চাকুরীজীবিদের অনেকের ক্ষেত্রে এই ব্যয় পুষিয়ে নেবার অন্যতম উপায় ঘুষ, যার বোঝা বইতে হয় পরোক্ষভাবে সমাজের সকলকেই। এর প্রতিবিধান ও প্রতিরোধের জন্য চাই ব্যাপক গণসচেতনতা।

অর্থনৈতিক কর্মসূচী

১. শরী'আহ ভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের প্রসারঃ

আধুনিক সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চাঙ্গা রাখতে হ'লে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্যতার কথা গুরুত্বের সাথেই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু প্রচলিত সব প্রতিষ্ঠানই সূদনির্ভর বিধায় শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক। এরই প্রতিবিধানের জন্য গত তিন দশক ধরে মুসলিম বিশ্বে গড়ে উঠেছে ইসলামী ভিত্তিক ব্যাংক, বীমা ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহ। কিন্তু সেগুলি পুরোপুরি শরী'আহ ভিত্তিক করা সম্ভব নয় বলে অভিজ্ঞমহলের বিশ্বাস। এর সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল এই যে, রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হ'ল সূদভিত্তিক ও পুঁজিবাদী অর্থনীতি। তাই ইসলামী ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন রয়েছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা, তেমনি রয়েছে নানা আইনী প্রতিবন্ধকতা।

২. করযে হাসানাহ ও মুযারাবা পদ্ধতির বাস্তবায়নঃ

সমাজে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি এবং বিত্তহীন দক্ষ ও যোগ্য লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারে করযে হাসানাহ ও মুযারাবা পদ্ধতি। ইসলামী অর্থনীতির এই অপরিহার্য বিধান দু'টি এদেশে অনুপস্থিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, এমনকি সংখ্যালঘু মুসলমানের দেশ শ্রীলংকাতেও মসজিদভিত্তিক করযে হাসানাহ প্রদান ও সোসাইটি ভিত্তিক মুযারাবা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এ দেশেও এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। সমাজের বিত্তশালী লোকদের করযে হাসানাহ দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই উদ্যোগ যদি মসজিদ কেন্দ্রিক হয় তাহ'লে সত্যিকার যোগ্য লোককে যেমন সুযোগ দেওয়া যাবে, তেমনি এলাকাভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি সমাজ সচেতনতা ও সমাজকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

মুযারাবা পদ্ধতি এদেশে চালু করতে সময়ের প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন হবে আইন কাঠামো বদলানোর পাশাপাশি উত্তম চরিত্রের লোক সৃষ্টির। উত্তম ও

যোগ্য লোকেরা মুযারাবার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি উভয়বিধ উপায়েই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু সমাজের বিত্তশালী লোকদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন তাদের ইসলামী অনুশাসন জানতে ও অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। এর ফলে দুঃসময়ে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া সহজ হবে বিনা সূদেই এবং বিনিয়োগ গ্রহীতা সূদ প্রদানের বাড়তি দায় হ'তে রক্ষা পাবে। করযে হাসানাহ দিলে সেই অর্থের জন্য আয়কর দিতে হবে না এবং মুযারাবার ক্ষেত্রে ছাহেবুল মাল বা সম্পদের মালিককে কেবল মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণের ঊর্ধ্বের জন্য আয়কর দিতে হবে এমন আইন করে বিত্তশালী মুসলিমদের মনোযোগ এ ক্ষেত্রে আকর্ষণ করা সম্ভব।

৩. ক্ষুদ্র বিনিয়োগের উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবনঃ

দরিদ্র অথচ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য পুঁজির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেই পুঁজির পরিমাণও যে খুব বেশী এমন নয়। কিন্তু তাই-ই তাদের কাছে সহজলভ্য নয়। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল হিসাবে ক্ষুদ্রঋণের প্রসার ঘটেছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় জাতীয়-আঞ্চলিক মিলিয়ে পাঁচ শতাধিক এনজিও এই কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছে।

মাইক্রোক্রেডিট মাকড়সার জালের মতো সমগ্র দেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু দরিদ্র জনগণ, বিশেষতঃ মহিলারা যারা ক্ষুদ্র ঋণের সর্ববৃহৎ ক্লায়েন্ট, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার কি সত্যি সত্যি দৃশ্যমান ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে? দু'চারটি সম্মানজনক ব্যতিক্রমী ঘটনাকে উদাহরণ হিসাবে দেখানো যায় কিন্তু সেসবের ভিত্তিতে সরলীকরণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লে বিপত্তি ঘটে। ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট হারে সূদসহ কিস্তি প্রদানের শর্তেই এনজিওরা ঋণ দিয়ে থাকে। পুঁজি পাওয়ার কোন সহজ উপায় না থাকায় নিরুপায় হয়েই দরিদ্র মহিলা ও পুরুষরা ঋণ নেয়। এই ঋণের সূদের হার যথেষ্টই চড়া।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য পরিচালিত সম্প্রতি সমাপ্ত কয়েকটি মাঠ গবেষণা তথ্য হ'তে দেখা গেছে, এনজিওদের প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে গ্রামীণ মহিলাদের দারিদ্র্য যেটুকু হ্রাস পেয়েছে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তাদের স্বনির্ভরতা অর্জন বা নীট দারিদ্র্য হ্রাস ঘটেনি। এর প্রধান কারণ, প্রাপ্ত ঋণ কাজে লাগিয়ে ঋণগ্রহীতারা যা উপার্জন করে তার বৃহৎ অংশই চলে যায় সূদ পরিশোধ করতে। ফলে তাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে যৎসামান্যই। তাদের অপেক্ষায় থাকতে হয় পুনরায় ঋণ পাবার জন্য। পুনরায় ঋণ না পেলে তার কর্মসংস্থানের উপায়টিও বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া সূদসহ মূলধনের কিস্তি শোধ করতে গিয়ে বহু সময়েই দারুণ বিড়ম্বনাময় পরিস্থিতির শিকার হ'তে হয় ঋণগ্রহীতাকে। সূদভিত্তিক এনজিওর মাঠকর্মীরা খাতকের ঘরের চালের টিন খুলে নিয়েছে, শেষ সম্বল দুধের গরু ধরে নিয়ে গেছে, এমনকি ন্যূনতম সভ্যতার মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে সধবার নাকফুল পর্যন্ত খুলে দিতে বাধ্য করেছে কিস্তির টাকা পরিশোধের জন্য এমন ঘটনা অহরহ প্রকাশিত হচ্ছে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলিতে। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও অপ্রতুল নয়।

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণের জন্য বিকল্প ইসলামী পদ্ধতিসমূহের ব্যবহার করতে হবে। মাইক্রোক্রেডিটের পরিবর্তে মাইক্রো ইনভেষ্টমেন্টের ব্যাপক প্রসার ঘটানো এখন সময়ের দাবী। উদ্যোগ নিতে হবে ঋণ নয়, বিনিয়োগ প্রদানের জন্য। এই উদ্দেশ্যে অংশীদারিত্বমূলক বিনিয়োগ স্কীম বা Participatory Investment Scheme চালু করা বাঞ্ছনীয়। এটি মুযারাবা পদ্ধতিরই একটি রূপ। এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হ'তে অর্জিত মুনাফার একটা অংশ পাবে সংশ্লিষ্ট এনজিও, বাকীটা পাবে উদ্যোক্তা। লাভ যদি না হয় তাহ'লে উদ্যোক্তাকে কোন বাড়তি দায় নিতে হবে না। এক্ষেত্রে যেহেতু পূর্বনির্ধারিত হারে সূদ পরিশোধের শর্ত নেই, সেহেতু লাভ না হ'লেও বাধ্যতামূলকভাবে সূদ প্রদানের দায়িত্বও নেই। কাজেই কষ্টার্জিত উপার্জনের সিংহভাগ তুলে দিতে হবে না এনজিওদের হাতে। প্রকৃত অর্থে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

গ্রহীতারাই উপকৃত হবে এই পদ্ধতিতে। পাইলট স্কীম হিসাবে হ'লেও এই পদ্ধতি চালু করা সময়ের দাবী। তৃণমূল পর্যায় হ'তে সূদ উচ্ছেদের জন্য এটি কার্যকর কৌশল হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে।

৪. **আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয় পরিহারঃ**

বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার পথ ধরে অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এক সময়ে নিয়মিত উপার্জনের ব্যয় সংকুলান না হ'লে ঋণের আশ্রয় নিতে হয়। এই মোক্ষম সুযোগে সূদ অনুপ্রবেশ করে সংসারে, সাধ্যের বাইরে যেয়ে বিলাসবহুল বাড়ী বানাতে হ'লে, ফ্যাশানেবল গাড়ী কিনতে হ'লে, কেতাদুরস্ত লাইফস্টাইল অনুসরণ করতে হ'লে ঋণ না করে উপায় নেই। বিকল্প উপায় দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ-উপার্জন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ঋণ ও সূদ অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। তাই ঋণ পেতে হ'লে সূদ দেবার অঙ্গীকার করতেই হয়। উপরন্তু বর্তমান সময়ে কিস্তিতে যেসব গৃহসামগ্রী ও ইলেকট্রিক-ইলেকট্রনিক দ্রব্যসামগ্রী বাজারে দেদারসে বিক্রি হয় সেসবেও যুক্ত রয়েছে সূদ। তাই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হ'তে সূদ উচ্ছেদ করতে হ'লে অতি অবশ্যই বিলাসিতা, অসুস্থ প্রতিযোগিতা, অন্যের অন্ধ অনুসরণ এবং আড়ম্বরপ্রিয়তা পরিহার করা যৌক্তিক দাবী।

উপসংহারঃ

আশা করা যায়, উপরে আলোচিত উপায়সমূহ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এদেশে সূদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি সম্ভব। এর ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষিত হারাম বর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস সূচিত হবে। এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মন-মানসিকতা প্রবলভাবে ইসলামমুখী। পক্ষান্তরে বিদ্যমান আইন-কাঠামো, সামাজিক আচরণ, এমনকি ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই চিন্তা-চেতনা ইসলামী ঈমান-আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। ফলে সমাজে বিরাজমান রয়েছে এক বিষম অবস্থা।

আজও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও রোমান-বৃটিশ আইন দ্বারা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রিত। এই প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, সূদ বর্জন ও উচ্ছেদের জন্য যেমন একদিকে চাই ঈমানের জোর ও সূদের নানামুখী ধ্বংসাত্মক কুফল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, অন্যদিকে তেমনি চাই সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। সূদ উচ্ছেদ ও বর্জনের কৌশল হিসাবে যেসব উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলিই শেষ কথা নয়, আরও উপযুক্ত পথ বা কৌশল উদ্ভাবিত হ'তে পারে। কিন্তু কাগজের পাতাতেই এসব কৌশল আবদ্ধ থাকলে কোন সুফল আসবে না। বরং বাস্তবায়নযোগ্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান রচনা করে সেই অনুযায়ী ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেলে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রাপ্তিরও আশা করা যায়।

বস্তুতঃ অর্থনীতি সূদবিহীন হ'লে বিনিয়োগের জন্য যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের সুষম বণ্টন ঘটবে। প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও সমাজ স্বার্থবিরোধী বিনিয়োগ বন্ধ হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধন ও বড় ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই ইসলাম সূদকে হারাম বা অবৈধ ঘোষণা করেছে। বস্তুতঃ যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হ'লে তার উৎসকেই সমূলে বিনাশ করতে হবে। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন ক্বারীব'। তবে সেজন্য নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। এক অর্থে সূদ উচ্ছেদ একটি জিহাদ। তাই এজন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবেই সূদের ভয়াবহ যুলুম হ'তে মানবতা মুক্তি পাবে। হালাল রিযিক প্রাপ্তির মাধ্যমে দো'আ কবুলের বদৌলতে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও ক্ষমা লাভের সুযোগ হবে। একই সাথে ইহলৌকিক কল্যাণের পাশাপাশি পারলৌকিক সাফল্যও নিশ্চিত হবে।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিংঃ প্রসঙ্গ জিজিএন

** {আমাদের অনুরোধে এটি মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী, অক্টোবর ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত মাননীয় লেখকের একটি পৃথক প্রবন্ধ। সেসময়ে দেশে গজিয়ে ওঠা এম,এল,এম. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'জিজিএন' ও 'নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রা:) লিমিটেড' সম্পর্কে এটি তাঁর একটি অনবদ্য রচনা। আলোচ্য বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে প্রবন্ধটি সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ায় পাঠকদের উদ্দেশ্যে এখানে এটি সংযুক্ত করা হ'ল। -প্রকাশক}*

সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে 'গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক' (জিজিএন) নামের একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে। জিজিএন এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড' সম্পর্কে প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। দৈনিক জনকণ্ঠ (৯, ১২, ১৭, ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০০), দৈনিক মানবজমিন (৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০), ইনকিলাব (৯ই সেপ্টেম্বর ২০০০), দৈনিক মুক্তকণ্ঠ (১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০০) প্রভৃতি পত্রিকায় এদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এদের সম্বন্ধে সন্দেহ ও প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। বিভিন্ন সূত্র হ'তে এই প্রতিষ্ঠান দু'টি সম্বন্ধে যা জানা গেছে এবং এদের নিজেদের প্রচারিত লিফলেট ও হ্যাণ্ডআউট হ'তে যা উপলব্ধি করা গেছে, তা থেকে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানটি জোরেশোরে এদেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের কৌশল এতই 'ফুলপ্রুফ' এবং গাণিতিকভাবে বিশুদ্ধ যে, এরা প্রতারিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে।

জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিউওয়ে যে গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে একে বলা হয় 'বাইনারি পদ্ধতি'। এই পদ্ধতির 'ডুপ্লিকেশন অব টু' তত্ত্ব অনুসারে একজন হ'তে দু'জন এই দু'জনের প্রত্যেকেই আবার দু'জন এমনিভাবে চক্রাকারে বা গ্রুপভিত্তিতে এরা সংখ্যা বৃদ্ধি করেই যেতে থাকে। গাণিতিকভাবেই এই সংখ্যা অসীম হ'তে পারে বা হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেই তারা নেটওয়ার্ক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকান বংশোদ্ভূত বর্তমান কানাডার নাগরিক মিঃ নবরত্নম শ্রী নারায়ণা থাসার স্বত্বাধিকারীতে প্রতিষ্ঠিত জিজিএন বাংলাদেশে কাজ শুরু করে ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস হ'তে। এদের প্রধান

কার্যালয় ঢাকার গুলশান দেখানো হ'লেও বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বনানীর একটি বাড়ী থেকে।

নেটওয়ার্ক ব্যবসা কমিশনভিত্তিক হয়ে থাকে। প্রথমে একজন ক্রেতা নির্দিষ্ট একটি অংকের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে, যা পণ্যের আসল মূল্যের চাইতে হয় অনেকগুণ অধিক। শর্ত থাকে যে, এই ক্রেতা কমিশন পাবে। কোম্পানী যে বেশী পরিমাণ অর্থ পূর্বেই আদায় করে রেখেছিল সেই অর্থ হ'তেই এই কমিশন দিয়ে থাকে। প্রথম জন কোম্পানীর এজেন্ট বা পরিবেশক হিসাবে যে দু'জনকে সংগ্রহ করেছিল তাদের প্রত্যেকেই এখন নিজেরা এজেন্ট বা পরিবেশক হিসাবে দু'জন করে নতুন ক্রেতা সংগ্রহ করবে। এক্ষেত্রে প্রথম জনের মত এই নতুন দুই এজেন্টও কমিশন পাবার হকদার হবে। এবারে নতুন যে চারজন ক্রেতা হয়েছে তারা নিজেরা এজেন্ট হিসাবে প্রত্যেকে দু'জন করে নতুন ক্রেতা সংগ্রহ করবে। ফলে ঐ চারজন তখন কমিশন পাবে। এভাবেই এজেন্ট ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কোথায় গিয়ে এই সংখ্যা থামবে তা কেউ জানে না।

অবশ্য প্রথম ক্রেতাই যদি এজেন্ট হ'তে ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ নতুন দু'জন ক্রেতা সংগ্রহ করতে না পারে, তাহ'লে তার কমিশন পাওয়ার আশা নেই। এক্ষেত্রে তার ব্যবসাও যেমন এখানেই শেষ, তেমনি তার প্রদত্ত পুরো টাকাটাই কোম্পানী অবলীলাক্রমে হাতিয়ে নেয়। অথচ সে এর বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে কোন আইনানুগ পদক্ষেপই নিতে পারে না। কারণ সে জেনে বুঝেই এই ফাঁদে পা রেখেছিল। সাহিত্যের ভাষায় একেই বলে 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান'। অনুরূপভাবে প্রথম ক্রেতা এজেন্ট হ'তে পারলেও তার শিকার নতুন দুই ক্রেতা যদি এজেন্ট হ'তে না পারে তাহ'লে তারাও একইভাবে প্রতারিত হবে।

এই নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে এমন একটা সময় আসবে, যখন আর এজেন্ট হওয়া সম্ভব হবে না। অর্থাৎ নতুন ক্রেতা পাওয়া যাবে না। তখন প্রান্তিক লোকটি নিশ্চিতভাবেই প্রতারিত হবে এবং এ রকম চূড়ান্তভাবে প্রতারিত লোকের সংখ্যা হবে লক্ষ লক্ষ। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই হবে বেকার ও শিক্ষিত যুবক-যুবতী।

জিজিএন ও তার বাংলাদেশী সহযোগী নিউওয়ে (প্রাঃ) লিঃ-এর কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও প্রতারণাগুলো আরও বিশদ বিশ্লেষণের দাবী রাখে। নীচে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হ'ল।

(১) প্রতিষ্ঠান দু'টি তাদের পণ্যের যে প্যাকেজ বিক্রি করছে তার মোট মূল্য টাকা ৭,৫০০/=। এর মধ্যে তারা টাকা ৩,৫০০/= লাভ করছে বলে নিজেরাই দাবী করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তাদের বিক্রিতব্য পণ্যটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোন ব্রাণ্ডের নয়। সুতরাং এর প্রকৃত গুণাগুণ ও মূল্য যাচাই করা যেমন অসম্ভব, তেমনি ঐ দ্রব্যটির সুবাদে কোম্পানী কত মুনাফা করছে তাও জানা অসম্ভব। যা হোক যিনি বা যারা চড়া মূল্যের ঐ প্যাকেজটি কিনছেন, তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে চড়ামূল্যে কিনতে স্বীকৃত হওয়ার ফলে এই লেনদেন বা ব্যবসা শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে জায়েয মনে হ'লেও তিনি প্রকৃতপক্ষে জেনেশুনেই প্রতারিত হচ্ছেন এবং প্রতারিত হয়েও প্যাকেজটি ক্রয় করছেন এই আশাতে যে, তিনি যদি তারই মত আরও দু'জন গ্রাহক বা ক্রেতা ম্যানেজ করতে পারেন তাহ'লে অন্ততঃ তার নিজের দেওয়া অতিরিক্ত ১৮০০/= টাকা ফেরত পাওয়া সম্ভব হবে।

এটা অনেকটা ঈশপের সেই লেজকাটা শিয়ালের গল্পের মত, যার নিজের লেজ কাটা যাওয়ার পর তার সহযোগী অন্যদেরও লেজ কাটতে প্রলুব্ধ করেছিল। এক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতা বা এজেন্ট এবং তার নতুন দুই শিকারের প্রত্যেকেই এই একই প্রতারণাপূর্ণ কাজ আরও দু'জন করে গ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তারা এটা এজন্যেই করবে যে, এর ফলে প্রথম এজেন্টের প্রথম দুই গ্রাহকের প্রত্যেকেই আবার টাকা ১৮০০/= করে ফেরত পাবে এবং প্রথম এজেন্ট নিজে ফেরত পাবে টাকা ২৪০০/=। মনে রাখা দরকার যে, এদের প্রত্যেকেই প্যাকেজটি কেনার সময় অতিরিক্ত টাকা ৩৫০০/= করে প্রদান করেছিল। সেই অর্থ হ'তেই এই 'মুনাফা' বা 'কমিশন' দেওয়া হচ্ছে। মাছের তেলে মাছ ভাজার এ যেমন এক চমৎকার উদাহরণ, তেমনি লোভের টোপ ফেলে চাতুর্যপূর্ণ প্রতারণারও এক অনন্য নযীর।

(২) কোম্পানী দু'টি টাকা ৭৫০০/= মূল্যের প্যাকেজের পণ্যের মধ্যে সার্ভিস চার্জ, সিকিউরিটি ও বিতরণের জন্য টাকা ৩৫০০/= (৪৩.৬৭%) ধার্য করেছে। অর্থাৎ মূল পণ্যটির দাম প্যাকেজ মূল্যের ৫৩.৩৩% বা টাকা ৪,০০০/= মাত্র। পরবর্তীতে গ্রাহক/এজেন্ট/পরিবেশক হয়ে গেলে সে এর বিপরীতে টাকা ৬০০/= ফেরত পেতে পারে, যদি নতুন দু'জন গ্রাহক ম্যানেজ করতে পারে। নাহ'লে সে কিছুই ফেরত পাবে না। এক্ষেত্রে পুরো টাকাটাই কোম্পানী হজম করে ফেলবে।

(৩) কোন কোম্পানী পণ্য বিক্রয়ের জন্য সাধারণতঃ সার্ভিস চার্জ দাবী করে না। ক্ষেত্রবিশেষে, বিশেষতঃ যন্ত্রপাতি বসানো ও চালু করার কাজে এ ধরনের চার্জ দাবী করলেও তা মূল্যের ২% হ'তে ২.৫% এর বেশী হয় না। উপরন্তু সার্ভিস চার্জ যদি দাবী করাই হয়, তাহ'লে পণ্য বা সেবা বিতরণের জন্যে পুনরায় বিতরণ বা ডিস্ট্রিবিউশন চার্জ নেবার নিয়ম নেই। অথচ এরা সেই গর্হিত কাজটিই করছে।

(৪) সিকিউরিটি বাবদ গৃহীত অর্থ সব সময়েই মূল ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আলোচ্য কোম্পানী দু'টি মূল ক্রেতাকে ঐ অর্থ বা তার কিয়দংশ ফেরত দেবে না, যদি না তিনি পরবর্তীতে এজেন্ট বা পরিবেশক হ'তে পারেন। এভাবে সিকিউরিটির নামে গৃহীত অর্থ আত্মসাৎ নিঃসন্দেহে যুলুম এবং ক্রেতাকে শোষণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৫) কোম্পানী দু'টি ষ্টেপ ১-এ লাভ করে টাকা ৩৫০০/=। কিন্তু গ্রাহককে লাভের কোন অংশ ফেরত দেবার বিধি নেই। তবে ঐ গ্রাহক যদি ষ্টেপ ২-এ এজেন্ট বা পরিবেশক হন, তাহ'লে তাকে অবশ্যই তিনটি প্যাকেজ বিক্রি করতে হবে এবং তিনি ঐ তিনটি প্যাকেজ হ'তে প্রতিটির জন্য টাকা ৬০০/= হারে মোট টাকা ১,৮০০/= ফেরত পাবেন। এক্ষেত্রে কোম্পানীর নীট মুনাফা থাকবে টাকা ৮,৭০০/=। নিঃসন্দেহে এটা বড় ধরনের প্রতারণা।

(৬) কোম্পানী হিসাব অনুসারে ষ্টেপ ১১-তে গ্রাহক পরিবেশককে ৮০% হারে মুনাফা দেবার কথা। অর্থাৎ তাদের দাবী অনুসারে তারা প্যাকেজ পিছু মাত্র টাকা ৭০০/= মুনাফা রাখবে। এক্ষেত্রেও তাদের মুনাফার শতকরা হার দাঁড়াচ্ছে ১৭.৫%। অবশ্য এর পূর্বেই তারা বিরাট অংকের মুনাফা করে

নিয়েছে। ষ্টেপ ১-এ তারা কাউকে কোন মুনাফা দেয়নি, ষ্টেপ ২-এ মাত্র টাকা ৬০০/= মুনাফা দিয়েছে এবং ষ্টেপ ৩-এ টাকা ১১১৪/= প্রদান করেছে। এই প্রক্রিয়ায় এজেন্ট/পরিবেশকের প্রাপ্য মুনাফার হার তখনই ক্রমাগত বেশী হ'তে থাকবে যখন একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও তারই আওতায় ক্রেতার সংখ্যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাবে। ধাপ বা ষ্টেপ যত কম হবে কোম্পানীর মুনাফা তত বেশী হবে। ধাপ বাড়াতে পারলে তবেই না ব্যক্তির/এজেন্টের/পরিবেশকের মুনাফা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে।

(৭) কোম্পানীর ঘোষিত নীতি অনুসারে কোন এজেন্ট/পরিবেশক একাধারে ৫১১ জন গ্রাহক তৈরী করতে পারলে তবেই ৭৩.৪০% হারে মুনাফা দাবী করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও স্বাক্ষরে এটা হ'তে হবে। কোন একজন গ্রাহকও কোন স্টেপ ধাপ ডিঙিয়ে যেতে বা সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না। সেক্ষেত্রে চ্যানেল বা যোগসূত্রের পরম্পরা ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে প্রথম ঐ পরিবেশকের উন্নতি বিঘ্নিত হবে এবং বর্ধিত হারে মুনাফা বা কমিশন প্রাপ্তিও বন্ধ হয়ে যাবে।

(৮) প্যাকেজের মাধ্যমে বিক্রিত পণ্যটির গুণ, মান ও প্রকৃত মূল্য জানার কোন উপায় নেই। বিক্রিত দ্রব্য ফেরতও নেওয়া হয় না। বিক্রয়-উত্তর সার্ভিসের সুযোগও নেই। সুতরাং পণ্যটির মেরামত ও সার্ভিসিং-এর কোন সুবিধাই ক্রেতা পাচ্ছে না, যা যেকোন বড় কোম্পানীর ব্যবসার রীতির বরখেলাপ।

(৯) বিক্রিত পন্যের ওয়ারেন্টি বা গ্যারান্টি পত্রের কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ অন্ততঃ এক বা দু'বছরের মধ্যে পণ্যটি ব্যবহারে অযোগ্য বা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেন তা বদলে নেবার বা মেরামত করার কোন ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা এই কোম্পানী দু'টি দিচ্ছে না। অথচ বিশ্বব্যাপী খ্যাতনামা কোম্পানীগুলোর এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

(১০) প্রসঙ্গতঃ আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। বাইনারী পদ্ধতি অনুসারে 'ডুপ্লিকেশন অব টু' রীতিতে অসীম সংখ্যক স্তরের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কোম্পানী দু'টো এরই আশ্রয় নিয়েছে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে একজন এজেন্ট পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করতে পারে এবং

কোম্পানী ঘোষিত বিপুল হারের মুনাফার মালিক হ'তে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটা প্রায় অসম্ভব। কারণ খুব কম গ্রাহক-এজেন্ট-পরিবেশকের পক্ষে ষ্টেপ ৪-এর নীচে যাওয়া সম্ভব। কারণ চেইনের সূত্র ছিঁড়ে যাবারই সম্ভাবনা বেশী। এর ফলে কোম্পানীরই বেশী লাভ হবে। একজন ক্রেতা যে পরবর্তীতে এজেন্ট বা পরিবেশক হচ্ছে তার ধাপ বা ষ্টেপ যত কম হবে কোম্পানীর মুনাফার পরিমাণও তত বেশী হবে। উদাহরণতঃ ষ্টেপ ৬-এ ৬৩টি প্যাকেজ বিক্রি করলে কোম্পানীর লাভ দেখানো হয়েছে টাকা ২,২০,৫০০/=। এজেন্টের পাওনা টাকা ১,২৩,৬০০/= বাদ দিলে কোম্পানীর নীট লাভ থাকে মোট টাকা ৯৬,৯০০/=। কিন্তু বাস্তবে এই ৬৩ টি প্যাকেজ ৩ স্তরে ৯টি পৃথক চ্যানেলে গ্রাহক/এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি করলে কোম্পানীর লাভ হবে টাকা ২৪, ৫০০/= টাকা ৭,৮০০/= টাকা ১৬,৭০০×৯= টাকা ১,৫০,৩০০/=। তাই কোম্পানী চাইবে যাতে গ্রাহকের ষ্টেপ কম হয় বা ষ্টেপ-এর সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও মুখে তারা একথা কখনোই বলবে না।

(১১) আরও একটি বিষয় গুরুত্বের সাথে অনুধাবনযোগ্য। সেটি হ'ল- পিরামিডের মত এই বিক্রয় কাঠামোর সর্বশেষ স্তরে যারা থাকবে, নিশ্চয়ই তারা পরবর্তী ধাপে গ্রাহক-পরিবেশক হওয়ার আশা নিয়ে পূর্বের গ্রাহক-পরিবেশকের নিকট হ'তে প্যাকেজ কিনবে। এরা সকলেই প্রতারিত হবে যখন আর নতুন ক্রেতা পাওয়া সম্ভব হবে না অথবা কোম্পানীটি হঠাৎ করে পাততাড়ি গুটাবে। যদি দশ হাযার ব্যক্তিও পিরামিডের শীর্ষে থাকে তাহ'লে ষ্টেপ ৯-এ থাকবে (যদি চেইন অবিচ্ছিন্ন থাকে) ৫১,১১,০০০ জন ক্রেতা। যারা মোট ৩,৮৩২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্যাকেজ কিনবে। এদের কাছ থেকে কোম্পানী মোট মুনাফাই আদায় করবে ১,৭৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে যারা পিরামিডের বাইরে ছিটকে পড়বে তাদের হিসাব পাওয়া হবে অত্যন্ত দুরূহ।

(১২) এই পদ্ধতি সত্যি সত্যি উত্তম ও বিশ্বস্ত হ'লে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো দেশে দেশে কারখানা তৈরী করে বা দোকান খুলে ব্যবসা করত না। বরং দেখা যায় অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে লিমিটেড কোম্পানী খুলে তারা পণ্য উৎপাদন করে, সংযোজন করে বা আমদানী করে ব্যবসা করছে। এরাও

কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। কিন্তু না জনগণ প্রতারিত হচ্ছে, না তাদের পণ্য ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে জনগণ সন্দিগ্ধ রয়েছে। তারা তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দিয়ে শো-রূমে পশরা সাজিয়ে রেখে খদ্দেরদের যাচাই-বাছাই করার সুযোগ দিয়ে বৈধভাবেই ব্যবসা করছে। উপরন্তু তাদের কোন নেটওয়ার্ক সিষ্টেম নেই।

পক্ষান্তরে জিজিএন পণ্যের বিবরণ ও গুণাগুণ জানাবার পরিবর্তে যেনতেন প্রকারে পণ্যটি ক্রেতার কাছে গছিয়ে দিতেই ব্যস্ত। পণ্যটি অগ্রিম দেখার সুযোগই তারা দেয় না। তারা তাদের ক্রেতাকে আরও দু'জন ক্রেতা কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, তারই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে যে, এরা টাকা নেবার অনেক পরে, ক্ষেত্রবিশেষে তিন মাসেরও পরে মাল দিচ্ছে না। এ ছাড়াও যারা এখন সক্ষম ক্রেতা ম্যানেজ করতে পারছে না, তারা টাকা দেবার পরেও পণ্য ও মুনাফা বা কমিশন কোনটাই পাচ্ছে না। তাদেরকে ক্রেতা সংগ্রহের জন্যেই চাপ দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রকৃত সত্য অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

(১৩) দুর্ভাগ্য যে, কতিপয় আলেম জিজিএন-র এই যুলুম ও প্রতারণামূলক ব্যবসাকে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। তাদের সাথে দ্বিমত পোষণের যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। উপরের বিষয়গুলি তাদের বিবেচনার খোরাক হ'তে পারে। বৈধ ব্যবসার জন্য শরী'আতের যেসব শর্ত আরোপিত হয়েছে, সেগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে জিজিএন পূরণ করছে বলে প্রতীয়মান হ'তে পারে। কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য যে অসাধু এবং পরিণাম ফল যে মারাত্মক, তা উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দিলে সহজেই বোঝা যাবে।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে এরা ইতিমধ্যে ৫০ কোটি টাকা হাতিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছে বলে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এদের ব্যবসায়িক পদ্ধতি ও কৌশলের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এরা আসলেই এদেশের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কৌশলে কাজে লাগিয়ে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে তাদের ও সেই সাথে দেশের জনগণের পকেট সাফ করে চলেছে।

চাকুরীর খোঁজে উদভ্রান্ত বেকার যুবকদের আড়ম্বরপূর্ণ এয়ারকণ্ডিশন রুমে বসিয়ে ওভারহেড প্রজেক্টের ব্যবহার করে চটকদার সব বক্তব্য দিয়ে আগামী দিনের রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে যেভাবে প্রলুব্ধ করা হচ্ছে, তা নৈতিকতারও পরিপন্থী। পণ্য বিক্রয়ের কৌশল শেখানো, পণ্যের গুণ বা মান এবং সমজাতীয় অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে তার তুলনীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা আদৌ না বলে কিভাবে তারা তাদেরই মত আরো ক্রেতা জোগাড় করতে পারবে, তারই কৌশল শেখানো হয় এসব ‘ওরিয়েন্টেশন’ ক্লাসে। এজেন্ট হ’তে গেলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ যরূরী। কিন্তু এই কোম্পানীর প্রশিক্ষণের কৌশল ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

(১৪) দৈনিক ইনকিলাবের ১২ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যায় জিজিএন এবং নিউওয়ে বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ বিজ্ঞাপন ছেপে জানিয়েছে যে, তারা বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সকল অনুমতিপত্র গ্রহণ, নিবন্ধীকরণ, সদস্যপদ গ্রহণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেই ব্যবসা করছে। তারা আরও দাবী করছে, তাদের ব্যবসায়ে কোনই গোপনীয়তা নেই। তাদের সকল কাগজপত্র সকলের জন্যে উন্মুক্ত।

এই ঘোষণার কোন দরকার ছিল না। বরং এতে মনে পড়ে যায়, ‘ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাইনি’। একথা সর্বজন বিদিত যে, কোন দেশে ব্যবসা করতে হ’লে সেদেশের সরকারী ও স্থানীয় সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেই তা করতে হয়। কিন্তু তাতে সততার বা নির্ভরযোগ্যতার গ্যারান্টি পাওয়া যায় না। যদি কোম্পানী দু’টো তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, সেক্ষেত্রে সরকারের যেমন বলার কিছু থাকবে না, তেমনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেও পাওনা আদায় করার জন্যে কারোরই কোন সুযোগ থাকবে না। কমিশন যদি পণ্য বিক্রয়ের জন্যে হয় এবং তাতে যদি কোন ফাঁক-ফোকর রয়ে যায়, তাহ’লে চোরাবালিতে পা পড়ার দশা হবে।

(১৫) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত ঐ বিজ্ঞাপনেই দাবী করা হয়েছে যে, ‘কোয়ালিফাই করার পর কমিশন পাননি এমন একটি উদাহরণও জিজিএন ও নিউওয়ের ইতিহাসে নেই। জিজিএন ও নিউওয়ের বিরুদ্ধে একটি মাত্রও সুনির্দিষ্ট প্রতারণার অভিযোগ বা মামলা নেই’। কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য।

জিজিএন ও তার সঙ্গী কোম্পানীটি ক্রেতাদের কমিশন দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, শুরুতেই এই ক্রেতার পকেট কেটে সাফ করছে তারা। নিম্নমানের পণ্য বাজার দরের চেয়ে বেশী মূল্যে তো বটেই, সেই সাথে আরও অন্যান্য চার্জের নামে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে নিচ্ছে তারা। শুধু তাই নয়, তাকে তারই মত আরও দু’জন ক্রেতাকে শিকার হিসাবে জিজিএন-এর গুহায় ঢুকিয়ে কমিশন পাবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হয় বা ‘কোয়ালিফাই’ করতে হয়।

তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ নেই বলে দাবী করা হয়েছে। এর পিছনে দু’টো কারণ রয়েছে। ১- যারা এদের শিকার হয় তারা লোভের বশবর্তী হয়েই এদের পাতা ফাঁদে পা দেয়। সুতরাং তারা কিভাবে প্রতারণার অভিযোগ আনবে? ২- এরা পণ্য সরবরাহে বিলম্ব করে। তখনও কেউ অভিযোগ করে না এজন্যে যে, ইতিমধ্যে আরও যে দু’জন গ্রাহককে সে সংগ্রহ করেছে, তারা এই অভিযোগের কথা শুনলে কেটে পড়বে। ফলে তার সম্ভাব্য কমিশন পাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

(১৬) তারা আরও দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বে এ ধরনের আরও বহু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কোম্পানী রয়েছে। তাদের এই দাবীর যথার্থতা যাচাইয়ে না গিয়েও বলা যায় যে, প্রতারণা প্রতারণাই। ইসলামে সূদ নিষিদ্ধ। সূদ পুঁজিবাদের জীয়নকাঠি। বিশ্বের দু-একটি দেশ বাদ দিলে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে সূদভিত্তিক বিনিয়োগ, লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে। তাই বলে কি সূদ হালাল হয়ে যাবে? কোন মুসলমান কি তাকে স্বীকার করে নিয়েছে? নেয়নি। কারণ হারাম যা তা হারামই। সব দেশের সকল মানুষের জন্যেই তা হারাম। এক্ষেত্রেও জিজিএন ও তার সঙ্গী প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ সূদের চাইতেও চক্রবৃদ্ধিহারে লাভ করে ও ক্রেতাকে ঠকিয়ে সেই ধরনের হারাম কাজটিই করছে।

(১৭) জিজিএন ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠান শুরু থেকেই তাদের নেটওয়ার্ক ব্যবসা চালাতে ‘ম্যানেজ করার’ পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে বলে পত্রিকান্তরে অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ নবরত্নম শ্রী নারায়ণা থাসা শ্রীলংকার নাগরিক ছিলেন। এদেশে তিনি কানাডার নাগরিক পরিচয় দানকারী একজন

বিদেশী। ল্যাণ্ড পারমিট নিয়ে আসার পর ওয়ার্ক পারমিট না থাকা সত্ত্বেও একজন বিদেশীকে কিভাবে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হ'ল তা রহস্যজনক। একইভাবে প্রশ্ন ওঠে যে, সরকারের বিনিয়োগ বোর্ড কিভাবে ল্যাণ্ড পারমিটধারী একজন বিদেশীকে রেজিস্ট্রেশন দিল? অভিযোগ রয়েছে যে, এসব ম্যানেজ করার পদ্ধতিতেই সম্ভব হয়েছে।

(১৮) যে বিশেষ প্রশ্নটি এখন দেশবাসীর সামনে জ্বলজ্বল করছে সেটি হ'ল- বর্তমান কানাডার এই নাগরিক সেদেশে বা পাশ্চাত্যের কোন দেশে এই ব্যবসা পরিচালনা না করে কেন বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে? এর উত্তরও খুব সহজ। প্রতারণার জন্যে দরিদ্র দেশকে বেছে নিলে বিপদ কম। দরিদ্র দেশের যুবক-যুবতীরা কর্মসংস্থানের পাশাপাশি মুনাফার সোনালী হাতছানিতে সহজেই প্রতারিত হয়। এমনকি খোদ সরকারও কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে শুনলে বহু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। উপরন্তু প্রয়োজনে 'ম্যানেজ' করার পথ খোলাই রয়েছে। জিজিএন সেই সুযোগটিই নিয়েছে।

(১৯) এদের লোভের ফাঁদে ইতিমধ্যেই ৩৪ হাযারের বেশী সদস্য পা দিয়েছে। এদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১০২ কোটি টাকারও বেশী বলে দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০০) জানিয়েছে। মাত্র দেড় বছরের মত এত স্বল্প সময়ে একশ' কোটি টাকারও বেশী অর্থ সংগ্রহের ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি-না জানা নেই। এদের ব্যবসায়ের প্রক্রিয়া জটিল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু সরলমনা ক্রেতা তথা এজেন্ট হ'তে অভিলাষীদের অধিকাংশের পক্ষেই এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। বরং পতঙ্গের মত তারা ঝাঁপ দিচ্ছে লোভের অগ্নিকুণ্ডে। অভিযোগ পাওয়া গেছে অনেকেই বিষয়-সম্পদ এবং ব্যাংকের সঞ্চিত অর্থ তুলে নিয়ে ছুটছে এই নেটওয়ার্ক মার্কিটিং ব্যবসার পিছনে। এক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালের শেষে দেশের শেয়ার মার্কেটে যে ভয়াবহ ধ্বস নেমেছিল তার কথাই মনে পড়ে যায়। সে সময় বছরের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে শেয়ার মার্কেট অদৃশ্য কারোর ইঙ্গিতে দ্রুত চাঙ্গা হ'তে শুরু করে। লোকেরা ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ হ'তে শুরু করে বোনেদের-স্ত্রীদের গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে। তারপর এক সময়ে মুনাফার

ফানুসটি ফেটে যায়। রাতারাতি পথের ফকীর হয়ে দাঁড়ায় অজস্র মানুষ। ঠিক একই রকম অবস্থা পরিদৃষ্ট হচ্ছে এই ব্যবসায়েও।

(২০) প্রসঙ্গতঃ আলবেনিয়ার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। 'পিরামিড স্কীম' নামে পরিচিত এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ব্যবসা ১৯৯৬ সালের শুরু হ'তে আলবেনিয়ায় সম্প্রসারিত হ'তে থাকে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নিজেদের সঞ্চিত অর্থ ছাড়াও বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে উচ্চহারে মুনাফা পাওয়ার আশায় বিপুলভাবে বিনিয়োগ করে এ ব্যবসায়। এমনকি ইতালী ও গ্রীসে কর্মরত আলবেনীয়রাও ব্যাংকে অর্থ না রেখে এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে থাকে। কোম্পানীগুলো প্রথমে ১৫% হ'তে ২৫% হারে মুনাফা প্রদান করত। ক্রমান্বয়ে মুনাফার এই হার বাড়াতে বাড়াতে তারা ৮০% এ উন্নীত করে। এরপর বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। ফলে মাত্র কয়েক মাসে ১৬টি কোম্পানী পিরামিড স্কীমের আওতায় ৫ লক্ষাধিক লোকের কাছ থেকে ১৫০ কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়। পরিণতিতে আলবেনিয়ার অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল আজও তার জের কাটেনি।

প্রতারণা ইসলামে হারাম। সেই হারাম সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য। জিজিএন গণিতের বাইনারী পদ্ধতির 'ডুপ্লিকেশন অব টু' থিওরী ব্যবহার করে তার প্রতারণাকে যেমন ফুলপ্রুফ পদ্ধতিতে উন্নীত করেছে, তেমনি ব্যবসার মোড়কে এবং কমিশনের মত নির্দোষ পারিতোষিকের ব্যবস্থা রেখে প্রতারণার বহিরঙ্গের চিহ্ন গোপন করতেও সমর্থ হয়েছে। তাই বলে এটা বৈধ হয়ে যায়নি অথবা প্রকৃত ব্যবসাও হয়ে ওঠেনি। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করলেই এর অন্ত র্নিহিত গলদগুলো ধরা পড়বে। সুতরাং লোভের বশবর্তী হয়ে এদের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে হারাম উপার্জন ও লোক ঠকানোর মত কবীরা গুনাহে শামিল না হওয়াই শ্রেয়।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এম,এল,এম) সম্পর্কে মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত ফৎওয়া।

প্রশ্নঃ 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?

উত্তরঃ মৌলিকভাবে দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা সিদ্ধ। একটির নাম 'মুশারাকাহ' (مشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০; নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*। অপরটির নাম 'মুযারাবাহ' (مضاربة) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপরজন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত সংস্থার প্রকাশিত The Index File, The Concept এবং Sales & Marketing Plan বই সমূহ এবং অন্যান্য উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ ও অর্থনীতি বিভাগের এবং সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণের যে লিখিত মতামত আমরা পেয়েছি, তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'লঃ

(১) বিধিসম্মত ব্যবসা বলতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে কোন বৈধ পণ্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা MLM) ব্যবসায় শুধু লাভের প্রলোভনই দেখানো হয়েছে। কোথাও লোকসানের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেই। তাই এটা ব্যবসা নাকি লাভের এজেন্সী সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া কঠিন ও জটিল। (২) এ ব্যবসায় সূদের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি করা না হ'লেও সম্পৃক্ততার বিষয়টি নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। (৩) এতে পিরামিড জুয়ার বিষয়টি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। (৪) সাধারণ কমিশন ব্যবসায়ীরা পণ্য যতটুকু বিক্রি হয়,

তার উপরে কমিশন পায় এবং অবিক্রিত পণ্য ফেরৎযোগ্য। কিন্তু ডেসটিনির (তথা এম,এল,এম) ব্যবসায়ে এ ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। (৫) ইনডেক্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য মতে কোন প্রলোভন না দেখিয়ে নবাগতদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হ'লেও প্রতিটি বক্তব্যের সাথেই প্রলোভনমূলক উপস্থাপনা লক্ষণীয়। (৬) এখানে জুয়ার উপস্থিতি রয়েছে। এটা এমন একটি খেলা যেখানে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে পণ্যকে আশ্রয় করে সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশের বাইরে গ্রাহককে সহজে অর্থ (Easy money) লাভের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এইসব (এমএলএম) কোম্পানীর পরিবেশিত পণ্যের বাজার মূল্য ধার্যকৃত মূল্যের অর্ধেকেরও কম হবে। এগুলি মানসম্পন্ন হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন ৭৫০০/= টাকার প্যাকেজে (১ম গ্রুপে) তাদের দেওয়া তথ্যমতে পণ্যের মূল্য ৩৫০০/= সার্ভিস চার্জ ১০০০/= সিকিউরিটি ১৫০০/= ডিস্ট্রিবিউশন ১৫০০/= মোট ৭৫০০/=। অর্থাৎ ৩৫০০/= টাকার পণ্যে ৪০০০/= টাকা বিভিন্ন নাম দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে। এর একটা অংশ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হচ্ছে।

মার্চ ২০০৮-এ 'ডেসটিনি' প্রকাশিত সেল্‌স এন্ড মার্কেটিং প্ল্যানে (পৃঃ ৭) বলা হয়েছে যে, তাদের মোট বিপণন লভ্যাংশ বণ্টন পরিমাণ প্রায় ৮৮ শতাংশ। অতঃপর ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১২টি ধাপের পর্যায় অর্জিত হবার পর প্রথম ক্রেতা পরিবেশককে যদি পরবর্তীকালে কোম্পানী থেকে প্রতিটি ভোক্তার ক্রয়কৃত পণ্য-সামগ্রীর উপর (ধরা যাক মাসিক ক্রয় ১০০ টাকা) লভ্যাংশ স্বরূপ বা সাপ্তাহিক কমিশন বাবদ শতকরা ৫ ভাগ হারেও দেয়া যায়, তাহ'লেও সপ্তাহে ন্যূনতম তাকে ৮,০০০ টাকা কমিশন দিতে হবে'। এইভাবে বিরাট লাভের অংক দেখিয়ে এরা মানুষকে টেনে নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় 'গারার' বা প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)।*

সঊদী আরবের জাতীয় গবেষণা ও ফৎওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটি (লাজনা দায়েমাহ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার

লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। পরিণামে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী বিপুল মুনাফা অর্জন করবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের ব্যবসা হারাম তা নিম্নরূপঃ

১. সূদঃ এই ব্যবসায় দুই প্রকার সূদই মওজুদ রয়েছে। একটি হ'ল সমজাতীয় বস্তুতে অতিরিক্ত নেওয়ার সূদ। অপরটি হ'ল একই বস্তুতে বাকীতে বেশী নেওয়ার সূদ। কোম্পানী যে পণ্য বিক্রয় করে ভোক্তার কাছে তা একটি ছল মাত্র। অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যও সেটা থাকে না।

২. প্রতারণা (আল-গারার)ঃ গ্রাহক প্রত্যাশিত ভোক্তা সৃষ্টি করতে পারবে কি-না সে সম্পর্কে সে অনিশ্চিত থাকে। এই পিরামিড নেটওয়ার্ক যত লম্বাই হোক না কেন এক সময় তা শেষ হ'তেই হবে। এমতাবস্থায় গ্রাহক এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে যে, সে নেটওয়ার্কের উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে লাভবান হবে না কি নিম্ন অবস্থানে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখা যায় যে, উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় গ্রাহক ব্যতীত অধিকাংশ পিরামিড সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা প্রতারণার শামিল শরী'আতে যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(মুসলিম)*।

৩. বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণঃ এর মাধ্যমে কোম্পানী ও সংশ্লিষ্ট ক্রেতা-পরিবেশকগণ অন্যদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হয়। আল্লাহ বলেন, لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'তোমরা বাতিল পন্থায় পরস্পরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*।

৪. ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতাঃ ব্যবসায় মানুষকে বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করা হয়, যেন ব্যবসাই মূল উদ্দেশ্য। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। আবার বিরাট লাভের টোপ দেয়া হয়, অথচ অধিকাংশ সময় তা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪)*।

কেউ কেউ এ কারবারকে এজেন্সি বা ব্রোকারিজ চুক্তির ন্যায় দাবী করে। এটা ভুল। কেননা একজন ব্রোকার সরাসরি পণ্য বিক্রির মাধ্যমে কমিশন লাভ করে। অন্যদিকে এমএলএম কোম্পানী পণ্যের উপর নয়, বরং বাজারজাতকরণের উপর কমিশন দেয়। ব্রোকারের উদ্দেশ্য থাকে কেবল পণ্য বিক্রয়, আর এমএলএম কোম্পানীর উদ্দেশ্য পণ্য নয়, বরং মেম্বারশীপ বিক্রয় তথা ক্রেতা-পরিবেশক দল বৃদ্ধি করা। ব্রোকার কমিশন লাভ করে কোম্পানীর নিকট থেকে, আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং-য়ে কমিশন গ্রহণ করা হয় ক্রেতাদের নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অনেকে আবার এই কমিশনকে উপহার আখ্যা দেন যা সঠিক নয়। কেননা সকল উপহার শরী'আতে সিদ্ধ নয়। যেমন ঋণদাতাকে উপহার দেয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত *(দ্রঃ বুখারী, মিশকাত হা/২৮৩৩; লাজনা দায়েমাহ, ফৎওয়া নং- ২২৯৩৫। তাং- ১৪/০৩/১৪২৫ হিঃ)*।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসা অসম মূল্য নির্ধারণ ও অতিরঞ্জিত আয়ের প্রলোভন দেখানোর কারণে অভিযুক্ত হয়েছে। আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রস্তাবিত ব্যবসায় সুযোগ সম্বন্ধীয় তালিকা থেকে এমএলএম কোম্পানীগুলোর নাম বাদ দিয়েছে। সংস্থাটি গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করার এই রীতি (এমএলএম) বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পিরামিড স্কীম পদ্ধতির ন্যায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(দ্রঃ Multi-level marketing- উইকিপিডিয়া)*।

তত্ত্বগতভাবেও এ ধরনের মার্কেটিং বিষয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এ মার্কেটিং-কে বলা হয়েছে, 'MLM is like a train with no brakes and no engineer headed full-throttle towards a terminal' অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ গতিতে স্টেশনমুখী একটি ট্রেনের মত যার কোন ব্রেক নেই, নেই কোন চালক'।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ 'ব্যবসা' সমর্থন করা যায় না। কেননা একজন গ্রাহককে তার আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের বশীভূত করে পণ্য বিক্রয় করতে বলা হয়। ফলে গ্রাহক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে

তোলে। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থের কেন্দ্রে পরিণত করে। এ সম্পর্ক তখন হয়ে যায় যান্ত্রিক। নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের স্থলে তখন সন্দেহ আর সংকীর্ণতাবোধ স্থান করে নেয়। নিজ গৃহ পরিণত হয় মার্কেট প্লেসে। যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক এ কাজে ঘৃণাবোধ করবে।

এদেশের অনেক লোক সম্মানজনক পেশা ছেড়ে কাঁচা পয়সার নেশায় এ ধরনের তথাকথিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এদের শিকারে পরিণত হয়েছেন আলেমদেরও একটি অংশ। অনেকেই তাতে ফুলে ফেঁপে উঠছেন এবং সেই সাথে চলে যাচ্ছে তাঁদের আখেরাতমুখী ঈমানী জাযবা। আর সে স্থান দখল করছে নিরেট বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা। অথচ ইসলামী দর্শন হ’ল পুঁজি ব্যয় করা। আর তার বিপরীতে বস্তুবাদী দর্শন হ’ল পুঁজি সঞ্চয় করা। যা মানুষকে রক্তচোষা ক্বারূণের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ’ল, সে হারামে পতিত হ’ল’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ’ *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

অতএব আমাদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশ্নে উল্লেখিত নামে বা অন্য নামে প্রচলিত এম.এল.এম ব্যবসাসমূহ শরী‘আত সম্মত হবে না। জান্নাত পিয়াসী মুমিনকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

{সূত্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮, প্রশ্নোত্তর নং ২/৮২}